পরমযোগিনী

আনন্দময়ী মা

প্রথম পর্ব

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

উৎসর্গ

অধ্যাপক শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

নিবেদন

বীণা হস্তে সুখাসীন নারদ একদিন জিজ্ঞেস করলেন বেদব্যাসকে, 'তোমাকে ক্ষুব্ধ দেখছি কেন ? এমন মহাভারত রচনা করেছো, তোমার আর কি চাই ?'

'এত বই লিখেও তৃপ্তি হলো না ?' ব্যাসদেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'কেন আমার এই অতৃপ্তি, আপনিই বলুন বিচার করে।'

'আমি জানি।' বললেন নারদ। 'তুমি ভগবানের অমল চরিত-কথা বলোনি বিশদ করে। ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তিপূর্ণ না হলে প্রীতিপ্রদ হয় না।'

'ভক্তিতেই তৃপ্তি। ভালবাসাতেই গৌরব। অশ্রুতেই আনন্দ।'

'রসো বৈ সঃ। ব্রহ্ম অখণ্ড রসস্বরূপ। সুতরাং ঈশ্বরের লীলাকথা বর্ণনা কর রসের আকারে। রসের আকার হচ্ছে রাস। বর্ণনা কর সেই রাসলীলা।'

ব্যাসদেব রচনা করলেন 'ভাগবত'। পরমবেদ্যকে শুধু জানা নয়, তাঁকে ভালবাসতে জানাই আসল বিদ্যা। বিদ্যা ভাগবতাবধি।

আমি ভাগবত-রচয়িতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা'র অলৌকিক জীবনলীলা রসের আকারে বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বর্ণ দিয়ে কি বোঝানো যায় অবর্ণনীয়কে! যিনি স্বরূপত মানবীয় বুদ্ধির অগম্য তাঁকে রেখা বা লেখা দিয়ে কেমন করে বাঁধবো ? আর সেই দিব্য জীবনলীলা বর্ণনা করতে পারি এমন ক্ষমতাই বা আমার কোথায়! পবিত্রতাও ত নেই।

আছে শুধু কৃপা। করুণারূপিণী আনন্দময়ী মা'র অহৈতুকী কৃপা।

যিনি এসেছেন জীবোদ্ধার করতে সেই বিশ্বপাবনী জগজ্জননী কৃপা করতে কাউকে বঞ্চনা করেন না কখনো। সেই মায়ের কৃপা অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়েছি। সেই মহতী মাতৃশক্তিরই ইচ্ছাক্রমে গৃহকোণে জ্বেলেছি পূজার প্রদীপ। অগ্নির স্বাভাবিক নিয়মেই প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে শিখা। আমার এই প্রার্থনার দীপশিখা।

সাহিত্য-কীর্তি নয়। আমি সাহিত্যিক নই। আমি জ্ঞানী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠও নই। আমি জানি না শাস্ত্র তন্ত্র মন্ত্র তত্ত্ব। আমি অজ্ঞ, অকিঞ্চন।

শুধু মাত্র ভক্তি দিয়েই এই দেবী-ভাগবত রচনার প্রয়াস পেয়েছি। জ্ঞানীর তত্ত্বে যিনি নিরাকার, ভক্তের প্রাণে তিনিই সাকার। তিনি নিজের থেকেই ছোট হয়েছেন ভক্তের জন্য। ঠিক অরুণোদয়ের সূর্যের মত। তবুও ভয়, আমার লেখার ত্রুটিতে মহিমান্বিতাকে বুঝি খর্ব করে ফেললাম। কতখানি সফলকাম হয়েছি সুধী ভক্তগণের বিচার্য।

আমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করেছি। কিন্তু সেই গঙ্গাজলের সঙ্গে অনেক ঘোলা জলও যে গেছে মিশে। তবে ঘোলা জল মিশলেও গঙ্গাজলের শুচিতা নষ্ট হয় না। আমরা দেখি ভাষা, সাহিত্য। ভগবান দেখেন ভাব, হৃদয়।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বলেন, 'আকুল ভাবই পূজা অর্চনার প্রাণ। অন্তরেই মহাশক্তির প্রস্রবণ। প্রার্থনায় সত্যিকার ভাব জাগলে কৃপা করে তিনি ফল স্বরূপে প্রকাশ পান।'

কলিকাতা,
শুভ মহালয়া,
আশ্বিন, ১৩৭৪। } গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপবার সময় কাগজের মূল্য ইত্যাদি অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থটিকে দুই পর্বে ছাপান হইল। ইতি—

প্রকাশক

প্রকাশকের নিবেদন

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব তাহার ধর্মচেতনায়। ভারত চিরদিনই চাহিয়াছে অধ্যাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইতে। কর্মমুখর সংসারচক্রে আবর্তিত হইয়াও আমাদের এদেশবাসীর ধ্রুবত্বের আলোকরশ্মির প্রতিই স্থির দৃষ্টি। ভারত অমৃতসন্ধানেই তাহার জীবনের সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করিয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, সূর্যের মধ্যে যেমন রহিয়াছে অমৃত, আমিও সেইরূপ। আমিই প্রথমজ, আমিই মূর্তামূর্ত জগতের এবং সকল দেবগণের পূর্ববর্তী। আমাতেই অমৃতের নাভি—অর্থাৎ, আমাতেই অমৃতের প্রতিষ্ঠা।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুইটি সত্তা রহিয়াছে। একটি তাহার নিত্যকালের 'অহং', যেটি তাহার আত্মা, তাহার অমৃত রূপ, তাহার শাশ্বত রূপ। অপরটি মানুষের দেশকালে অবচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র 'অহং', প্রাত্যহিকতার দ্বারা যে আবৃত এবং ক্লিন্ন ; সে বৃহৎ হইতে, সমগ্র হইতে নিজেকে সঙ্কুচিত রাখে, ভেদবুদ্ধি দ্বারা নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে, আর এই ভেদাত্মক আত্মকেন্দ্রিকতা হইতে আসে যত পাপ, মানুষ হয় গৃধ্নু। মানুষের মধ্যে এই দুই সত্তার বিরোধ নিয়ত চলিতেছে। কিন্তু মানুষের জীবনে এমন মাহেন্দ্রক্ষণও আসে, যখন সে তাহার আত্মকেন্দ্রিকতা হইতে নিজেকে মুক্ত করে, যখন অমৃতের অধিকারী হওয়ার সাধ তাহার মনে বলবতী হইয়া উঠে।

মানুষের জীবনে এই শুভমুহূর্ত উন্মেষণার প্রধান সহায়ক পৃথিবীর মহাসাধক ও মহাসাধিকাগণ। ইঁহারা দিবালোকের স্বর্ণসিংহদ্বার মুক্ত করিয়া নিবিড়তরভাবে ভগবৎ উপলব্ধির গভীরতায় আমাদিগকে আকর্ষণ করেন। ইঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা পরমেশ্বরকে আমাদের বুকের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্তী করিয়া অনুভব করি। অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হই—আমাদের মন অমৃত-উৎসাভিমুখী হয়।

এমনই একজন মহাযোগিনী মহাসাধিকা আনন্দময়ী মা। আনন্দময়ী মাকে আমি প্রথম দেখি ১৯২৮ সালে, তাহার পর তাঁহার রাঁচি আশ্রমেও তাঁহাকে দেখিয়াছি। অতঃপর ১৯৬৫ সালে আগরপাড়া আশ্রমে দুর্গাপূজার

সময়ে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। সেই সময়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিলেন। মায়ের এক ভক্ত অধ্যাপক চিত্তবাবুকে আমি আমার মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করি, মায়ের সহিত আলাপ করার অভিলাষ ব্যক্ত করি। আমার আগ্রহে চিত্তবাবু এবং আগরপাড়া আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নির্মলবাবু মায়ের সহিত আমার সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য ঘটাইয়া দেন। আনন্দময়ী মায়ের সহিত আমার সেই সাক্ষাৎ এবং আলাপের দিনটি আমার জীবনে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে নানা কারণে। অল্পক্ষণের আলাপে আমার মনে হইয়াছিল যে, অলক্ষ্যে তাঁহার আশীর্বাদ আমার উপরে বর্ষিত হইয়াছে। মায়ের আশীর্বাদলাভে আমি নিজেকে স্নেহধন্য মনে করিতেছি। সেদিন আনন্দময়ী মায়ের মধ্যে মাটির প্রদীপের মতো স্নিগ্ধ আলোকশিখা লক্ষ্য করিয়া আমি অভিভূত হই। আমার মনে হয়, স্নিগ্ধ দীপের দীপ্তি বিকিরণ করিয়া মানুষকে অধ্যাত্মপ্রেরণায় জাগ্রত করার জন্যই যেন তাঁহার আবির্ভাব।

মায়ের সহিত আলাপের পরে আমি চিত্তবাবুকে মায়ের একখানি জীবনকথা প্রকাশ করিবার কথা বলি। মায়ের ভক্তরা তাঁহার লীলামাহাত্ম্য জানেন। তথাপি তাঁহার জীবনমহিমা সর্বসাধারণের গোচর করিবার জন্য আমার একটা প্রবল বাসনা জাগে। আমার আগ্রহাতিশয্যে চিত্তবাবু আমার সহিত গ্রন্থকার শ্রীগঙ্গেশ চক্রবর্তীর আলাপ করাইয়া দেন। ঐকান্তিক ভক্তি ও বিশেষ নিষ্ঠার সহিত গ্রন্থকার এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা পরমযোগিনী আনন্দময়ী মায়ের জীবনমহিমা জানিবার জন্য কৌতূহলী, তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমার একান্ত বিশ্বাস আছে। আনন্দময়ী মায়ের জীবনকথা ও লীলাপ্রসঙ্গ প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। গ্রন্থকার শ্রীগঙ্গেশ চক্রবর্তী মহাশয় যেরূপ নিষ্ঠার সহিত এই গ্রন্থরচনা-রূপ দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন, সেজন্য তিনি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সর্বসাধারণের প্রশংসালাভেও তিনি বঞ্চিত হইবেন না।

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

এক

উষার আলো প্রবেশ করে ভগ্ন বাতায়ন পথে গৃহাভ্যন্তরে। সেই নির্মল আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ঘুমন্ত শিশুর মুখমণ্ডল। শিশু জাগরিত হয়। দৃষ্টি বিনিময় হয় তার প্রকৃতির সাথে। শিশু হাসে। খিল খিল করে ওঠে হেসে। নির্মল আনন্দের ঢেউ তুলে তুলে বইতে থাকে তার অন্তর্লোকে। তারই ছোঁয়াচ এসে লাগে জননীর মনো-জগতে। জননীও হয়ে ওঠেন উৎফুল্ল। উৎফুল্লচিত্তে চুম্বন করেন শিশুর কোমল ওষ্ঠে। নিরাশ্রয় শিশু জড়িয়ে ধরে তার জননীকে। জননীও ছোট্ট শিশুকে তাঁর কোলে আশ্রয় দিয়ে পান তৃপ্তি। পরম তৃপ্তি।

দূর হতে ভেসে আসে করতালের শব্দ। মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনির মত ভোরের বায়ুতে জেগে ওঠে তারই অনুরণন। এক অন্ধ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণনামের সঙ্গীতে মুখরিত করে তোলে তাদের গৃহদ্বার। গৃহে গৃহে কৃষ্ণনাম পৌঁছে দেওয়াই যেন তার ব্রত।

ভক্তিমতী জননী শিশুটিকে কোলে নিয়ে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ান। নামগান শেষ হলে কিছু ফল এনে দেন তার ঝোলায়।

অমনি সে বলে ওঠে, 'তোর সন্তানের মঙ্গল হোক মা। তোর মেয়ে যেন সর্বত্যাগিনী হয়। ভগবান করুন।'

জননী মোক্ষদাসুন্দরীর অন্তর কেঁপে ওঠে। এই শেষের কথাটি তাঁর মোটেই লাগে না ভাল। 'কেন এমন আশীর্বাদ ও করলো এই ভোরের বেলা! তবে কি ওকে ডেকে বলবো, তুমি তোমার আশীর্বাদ নাও ফিরিয়ে!'

অজানা এক ভয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে মোক্ষদাসুন্দরীর অন্তর। মেয়েকে কোলে নিয়েই ছুটে বাইরে এসে চীৎকার করে ওঠেন,

ঠাকুর! ওগো ঠাকুর! শোনো। এ আশীর্বাদ তুমি ফিরিয়ে নাও। কোথায় গেলে ঠাকুর!

ঘর হতে ছুটে আসেন কন্যার পিতা বিপিনবিহারী, এই ভোরের বেলা আকুল হয়ে কাকে কি বলছো? কোথায় তোমার ঠাকুর?

এই মাত্র যাকে ফল দিলাম। কেন, তুমি গান শোনোনি?

—হ্যাঁ, গান তো শুনলাম। এমন নামগান জীবনে শুনিনি। সে কোথায় গেল?

—তাকেই তো ডাকছি। এই দেখলাম, এই নেই। কোথায় গেল সে? তুমি খোঁজ করো।

উদ্বিগ্ন হয়ে বিপিনবিহারী ছুটলেন, সেই অন্ধ ব্রাহ্মণের সন্ধানে। সমস্ত খেওড়া গ্রাম অনুসন্ধান করেও সেই ব্রাহ্মণের দর্শন মিললো না। অন্ধ ব্রাহ্মণের অলৌকিকভাবে অন্তর্ধান খেওড়া গ্রামের ছোট্ট ভট্টাচার্য পরিবারের জীবনে দিয়ে গেলো সংশয়ের দোলা।

পিতার মনে যখন সংশয়, মাতার প্রাণ যখন অজানা এক ভয়ে দোদুল্যমান, তখনও যেন শিশুর মুখে চোখে ফুটে রয়েছে নির্মল হাসির ছটা। ভূমিষ্ঠ হতেই শিশুর মুখপদ্মে এই নির্মল হাসি। তাই তো পিতা নাম রাখলেন নির্মলা। নির্মলাসুন্দরী। যার নাম নির্মল, সেই তো নির্মলা। সুন্দর মাত্রেই নির্মল নয়। নির্মল বলেই সুন্দর। যে নির্মল সেই সুন্দর। যে নির্মলা সেই সুন্দরী। তাই তো নির্মলাসুন্দরী।

এই পবিত্র হাসির মধ্য দিয়ে শিশু যেন তার জননীকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস পায়। তার ভবিষ্যৎ জীবনের ত্যাগকে এইভাবে জননীও যেন হাসিমুখে নিতে পারেন বরণ করে—এ যেন তারই আভাস।

শিশুর হাসির সুরে সুর মিলিয়ে নিয়তিদেবীও হেসে ওঠেন। সৃষ্টিকর্তাও হাসেন। ভোরের পাখীরা আকুল ভাবে ডাকাডাকি করে চতুর্দিক করে তোলে মুখরিত। সূর্যদেব প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ

করে নিরীক্ষণ করতে থাকেন সেই শান্ত, অপার শান্তিময়, নির্মলচিত্ত শিশুকে। মহাশিশুকে। নির্মলা। নির্মলাসুন্দরীকে।

দিনের আলোয়। রাত্রির অন্ধকারে। শিশুর ছদ্মবেশে আত্ম-গোপন করে, অনাদিকালের এই মহাশিশু দুর্জ্ঞেয় মহাভাবের শৈশব-লীলায়, পৃথিবীর মানুষের নিকট হয়ে রইলেন এখনও অপ্রকাশ।

দুই

বিপিনবিহারী পিতৃভূমি বিদ্যাকূট পরিত্যাগ করে, আশ্রয় নিলেন এসে এই খেওড়া গ্রামে। মাতুলালয়ে। প্রথম সন্তান জন্মের পর, সেই যে তিনি ঘর ছাড়া, দেশ ছাড়া হয়েছিলেন, আর ফিরলেন ঠিক কন্যাটির মৃত্যুর পর। তিন বৎসর অতিক্রান্ত করে। ভিন্ন এক বেশে। পরিধানে গেরুয়া-বসন। কৌপীন। মুখে হরিনাম। মেতে আছেন হরিসংকীর্তনে। বৈরাগ্য ভাব। খেওড়া গ্রাম মুগ্ধ হলো বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যের নামগানে।

বিশাল অট্টালিকা নয়। ছোট গৃহ। ছোট সংসার। অভাব আছে। অভাব-বোধ নেই। শান্তির সংসার। সংসার নয়, যেন ঋষির আশ্রম। বাসের যোগ্য দু'খানি চালাঘর। ছোট্ট উঠান। তুলসীমঞ্চ। দু'খানি ঘরের একখানি ঠাকুরঘর। ঘরে আছে শালগ্রাম শিলা। পিতৃগৃহ বিদ্যাকূট হতে আসবার সময় এই শালগ্রাম শিলাও নিয়ে এসেছেন বিপিনবিহারী। পূর্বপুরুষের কেহ কেহ সন্ন্যাসও গ্রহণ করেছিলেন।

রাত্রি যায়। দিন আসে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঘুরে আসে। ঘড়ির কাঁটার মত ধীরে ধীরে আবর্তিত মানুষের জীবন।

মোক্ষদাসুন্দরীর গর্ভে আবির্ভাব হলো দ্বিতীয় সন্তানের। শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থা, তবুও অস্বস্তি নেই। দৈহিক সৌন্দর্যও দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগল।

'যেন রূপের কুসুম'—বলাবলি করে পাড়া-প্রতিবেশিনীরা।

মনের তাঁর স্থিরতা নেই।

বিচিত্র সব দেব-দেবীর চিন্তায় মন হয়ে থাকে ভরপুর।

কেন এমন হয়? বলতে পারেন না।

ঠিক সন্ধ্যে বেলা।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী ঘরে নাই। গেছেন কসবা কালীবাড়িতে পূজা দিতে।

ঠাকুরঘরে স্বামী নামগানে বিভোর।

তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে, নমস্কার করে যেই মাথা তুলেছেন, অমনি অভাবনীয় এক দৃশ্য অবলোকন করলেন। তুলসী নেই। পরিবর্তে নব-সূর্যবরণা অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিতা, সৌম্যা এক দেবী-মূর্তি তুলসীতলা আলোকিত করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। পর মুহূর্তেই নয়নগোচর হলো, দেবীমূর্তির স্থানে এক অপূর্ব জ্যোতি। যে জ্যোতি চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরই দেহাভ্যন্তরে এসে প্রবেশ করলো। তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন তুলসীতলায়।

যখন জ্ঞান হলো, তখন রাত্রি অধিক।

স্বামী মাথার কাছে বসে পাখার বাতাস করছেন। ধীরে ধীরে চোখের পাতা দুটি উন্মীলিত হলো। যেন কয়েক যুগ ধরে নিদ্রিত ছিলেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন, কি গো, কি দেখেছিলে? হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে গেলে যে?

যে মূর্তি, যে ভাবে দৃষ্টিগোচর করেছিলেন, স্বামীর নিকট আনুপূর্বিক বললেন।

বিপিনবিহারী মনোযোগ দিয়ে শুনে মন্তব্য করলেন,

'গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কারভূষিতাম্'।

তুমি দেখেছো শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীকে। কোন চিন্তা নাই। আমাদের ভালই হবে।

পরের দিন ভোরবেলা এসে পৌঁছুলেন শাশুড়ী ঠাকুরাণী কসবা হতে। গ্রামের লোকের সাথে গিয়েছিলেন নৌকা করে।

কসবার কালী খুবই জাগ্রত। তাই পূজা দিয়ে এলেন। অনেক দিনের মানত ছিল।

গৃহে পৌঁছেই ডাকতে লাগলেন, ছেলেকে।—ওরে, ও বিপিন। বিপিন শোন।

—কি, মা!

—ওরে আমি কি বলতে কি বলে এলাম মা-কালীকে।

মৃদু হেসে বিপিনবিহারী বললেন,—কি বলেছো মা?

—মা-কালীকে কোথায় বলবো বিপিনের যেন একটি ছেলে হয়। তা নয়—বলে এলাম, এবারে যেন বিপিনের একটি মেয়ে হয়। মা-কালীর দিকে তাকিয়ে আমি স-ব ভুলে গেলাম। কি আমার মন! ও আমার কপাল!

এবারে বিপিনবিহারী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। গত রাত্রের ঘটনার সাথে মায়ের প্রার্থনায় কোথায় যেন একটা অভিন্নতা দেখতে পেলেন। পর মুহূর্তেই নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে বললেন,—মা, ভগবানের রহস্য সামান্য মানুষ কি করে বুঝবে বলো? তুমি ভুল করনি। ঠিকই প্রার্থনা জানিয়েছো। এত দূর থেকে এলে। বসো। বিশ্রাম করো। সব বলছি।

তারপর মা শুনলেন। সব কিছু। ছেলের মুখ হতে। আনন্দাশ্রু নির্গত হলো। আনন্দিত চিত্তে বললেন,—এমন বৌ ক'জনে পায়। গরীবের ঘর তাই। বৌমা আমাদের সতীলক্ষ্মী।

তারপর কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার বলে উঠলেন,—তা' হলে লক্ষ্মীরূপ ধরে স্বয়ং দশভুজা ভগবতীই আমাদের ঘরে আসছেন। গরীবের ঘর। এখন কি খেতে দিবি তাই ভাব্। এবারে শুধু কীর্তন করলেই হবে না। ভাল ভাল খেতেও তো দিতে হবে 'মা'-কে।

তারপর দু'হাত জোড় করে ভগবতীর উদ্দেশে প্রণাম ক'রে বৃদ্ধা বললেন,—মা ভগবতী, জগদম্বা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

বিপিনবিহারী হাসিমুখে বললেন,—কেন শুধু শুধু উপচারের কথাই ভাবছো মা? দেখ আমি ভক্তি দিয়েই মা'কে কেমন খুশি রাখি।

*　　　*　　　*

এই হলেন পিতামহী, পিতৃদেব ও মাতৃদেবী। সকলেই দিব্য-ভাবের ভাবুক।

তিন

এমন ভগবৎ-ভাবের গৃহ না হলে কি আর এমন মেয়ে জন্মায়!

সেদিন বিপিনবিহারী প্রতিবেশী চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে কীর্তনে গেছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি অধিক হতে চললো। তবুও ফিরবার নাম নেই। মোক্ষদাসুন্দরী আর অপেক্ষা না করে শুয়ে পড়লেন।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন জানেন না। ঘুম ভাঙলো নূপুরের গুঞ্জনে। তখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন নূপুরের ঝঙ্কার। নৃত্যেরই তালে তালে পা ফেলে কে যেন নৃত্য করছে। তাঁরই ঘরের মধ্যে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

নিবিড় অন্ধকার। কিন্তু নূপুরের গুঞ্জন স্পষ্ট কানে আসছে। নৃত্য। কালীনৃত্য হচ্ছে। মহারৌদ্রী স্বয়ং নৃত্য করছেন। অভাবনীয় দৃশ্য। ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। পাশের ঘরে শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে ডাকবার সাহসও হারিয়ে ফেলেছেন। গলা শুষ্ক হয়ে গেছে। কণ্ঠ রুদ্ধ। শুধু হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত তালে চলছে। অপ্রত্যক্ষ অশরীরী মূর্তির নৃত্য। দেবী। মহাদেবী। মহাকালীর নৃত্য। গৃহাভ্যন্তরে। তাঁরই দৃষ্টির সম্মুখে। বিস্ময়ে বিহ্বলা।

কিন্তু তিনি আর চোখ খুলতে পারছেন না। চোখের পাতা দুটি জোর করে বন্ধ করে রেখেছেন। এইভাবে কত সময় অতিক্রান্ত হলো জানেন না। সম্বিৎ ফিরে এল তখন, যখন দরজায় আঘাতের শব্দ কর্ণগোচর হলো।

স্বামী এসেছেন। ডাকছেন। পাশের ঘর থেকে শাশুড়ী ঠাকুরাণীও ডাকছেন।

—বৌমা, বৌমা, দরজা খোল, বিপিন এসেছে।

উঠি উঠি করেও ওঠা হচ্ছে না। শরীর অবশ। কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা চলে না। ঢুলু ঢুলু চোখে টলতে টলতে এসে দরজা খুলে দিলেন।

বিপিনবিহারী গুন্ গুন্ কর গাইছেন,

—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।'

—রাত্রি শেষ প্রহর। আর ঘুমাবো না। বাকী সময়টা নাম-গান করেই কাটিয়ে দেবো। বললেন বিপিনবিহারী।

পর মুহূর্তেই বিচলিত হয়ে মোক্ষদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, —আচ্ছা বলতে পারো? আমি এতক্ষণ যা দেখলাম আর শুনলাম, সবই কি সত্যি—না স্বপ্ন?

উদ্বিগ্ন হয়ে বিপিনবিহারী প্রত্যুত্তর করলেন,—এত সময় ধরে আবার কি দেখলে? বল—বল, শুনি।

তারপর শুনলেন। সব কিছু। যেমন যেমন ঘটেছিল।

বিপিনবিহারীও কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে বিচলিত মোক্ষদাসুন্দরীকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্য বললেন,—স্বপ্ন টপ্ন দেখেছো। ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ো না।

কিন্তু নিজে নিজের মনকে খাঁটি করে রাখলেন। স্বয়ং কালী-দেবীই তাঁর ঘরে কন্যারূপে অবতীর্ণা হচ্ছেন।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার হরিসংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে ঠাকুরঘরে। সন্ধ্যা হতেই কীর্তন শুরু হলো। গ্রামে এক সাধু এসেছেন। তাঁকেও নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁকে উপলক্ষ করেই এই নামগান। প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীরা অনেকেই কীর্তনে অংশ নিয়েছেন। সমস্ত রাত্রি ধরে চলবে। কীর্তন খুব জমে উঠেছে। সাধুজীও ভাবে বিভোর হয়ে পড়েছেন। ভাবে ঢল ঢল শান্তমূর্তি ধারণ করলেন। অনির্বচনীয় এক আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত হয়ে চললো গৃহাভ্যন্তরে। ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীর হতে লাগলো।

রাত্রি শেষ হতে এখনও তিন দণ্ড বাকী। হঠাৎ মোক্ষদা-সুন্দরীর ব্যথা উঠলো। সব কিছু প্রস্তুত ছিল। উঠোনে আঁতুড়-ঘর তৈরী করা হয়েছিল। প্রতিবেশিনীরা তাঁকে ধরে সেই ঘরে নিয়ে গেলেন। ধাই এল। পূর্বেই বলা ছিল।

কীর্তন বন্ধ হলো না। অবিরাম চলতে লাগলো।

দেখতে দেখতে প্রসব হয়ে গেল। কন্যা। ক্রন্দনধ্বনি নয়। মুখে অস্ফুট হাসি। নবজাতকের মুখপদ্মে পবিত্র হাসির ছটা। সুন্দর। নির্মল। শিশু।

ধাই বলে ওঠে,—ওগো তোমরা সব দেখে যাও। এমন মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। জন্মেই হাসছে। এ সামান্য মেয়ে নয় গো! এ দেবী ভগবতী।

একে একে এলেন প্রতিবেশিনীরা। স্বামী। শাশুড়ী ঠাকুরাণী। এলেন সাধুজী। সকলেই আনন্দিত হলেন। মুগ্ধ হলেন পবিত্র শিশুর হাসিমাখা মুখপদ্ম দর্শন করে।

সাধুজী গুরুগম্ভীর স্বরে মাতৃ-বন্দনা শুরু করলেন,

'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।'

আবির্ভূতা হলেন জগতের জননী আনন্দময়ী মা। এই পৃথিবীর মাটিতে। মানবলোকে।

বাংলা ১৩০৩ সনের ১৯শে বৈশাখ, ইংরাজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল। বৃহস্পতিবার। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থী তিথি।

দিনে দিনে শিশু বড় হয়ে ওঠে। সপ্তাহ। মাস। বছর। ঘুরে আসে।

বাপ মা আদর করে নাম রেখেছেন নির্মলা। ভোরবেলা মোক্ষদাসুন্দরী মেয়েকে তুলসীতলায় গড়াগড়ি দেওয়ান। তারপর চঞ্চল হস্তে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে লাজমধুর কণ্ঠে আদর করতে থাকেন,—ওরে আমার সোনা মানিক মেয়ে রে,—

মাতৃস্নেহসুধা পান করে শিশু আশ্বস্ত হয়। তার মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে বাণীহীন তৃপ্তির এক সুস্পষ্ট ছবি।

এই ভাবে ছোট্ট শিশুর জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনারাজি জননীর জীবনসঙ্গীতে সৃষ্টি করে চলে নূতন নূতন রাগের। নবজাতক নির্মল হাসির মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র গৃহকে ক'রে তোলে পরিপূর্ণ। নিঃসঙ্গ মাতার প্রতিটি মুহূর্তকে ক'রে তোলে কর্মময়। মধুময় করে তোলে তার জীবন পলকে।

চার

শৈশবকাল হতেই নির্মলাসুন্দরীর অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়। পাঁচ বছরের মেয়ে নির্মলা। বই বগলে করে ছোট্ট মেয়ে এসে ঢুকলো পাঠশালায়। বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় পড়িয়ে দিলেন অ, আ। পরদিনই অ, আ পড়া দিয়ে পাঠ নিলো ক, খ। অবাক হলেন গুরু মহাশয়। আদর করে বললেন, 'তুমি সামান্যা মেয়ে নয় গো। তুমি দেবী ভগবতী। আমার চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গেল, কিন্তু তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে জীবনে দেখিনি গো।'

পরের দিন আবার পড়া দিলো ক, খ, গ। কয়েকদিনেই সমাপ্ত হলো তার 'বর্ণপরিচয়ে'র বর্ণজ্ঞান।

কিন্তু পাঠশালায় বেশী সময় আবদ্ধ থাকতে তার মন চায় না। চঞ্চল শিশুর চঞ্চল মন। পড়তো না। কিন্তু কেমন করে যেন তার পড়া হয়ে যেতো।

অনেকদিন পর স্কুলে এসেছে। সহপাঠিনীরা অনেক পাতা পড়ে ফেলেছে। সহপাঠিনীদের সাথে সাথে গুরুমহাশয় তাকেও দিলেন পাঠ। পরের দিন ধরলেন পড়া। একটিও হলো না ভুল।

স্কুলে এসেছেন ইন্সপেক্টর। ছোট মেয়ে নির্মলাকে বললেন, একটি পদ্য মুখস্থ বলতে। বললো সে। নির্ভুল। শিশুর সুমিষ্ট কণ্ঠের ত্রুটিহীন কবিতা শুনে মুগ্ধ হলেন ইন্সপেক্টর। গর্বিত হলেন গুরুমহাশয়।

আশ্চর্যান্বিত হলেন পিতামাতা। এমন সোজা, বোকা, বুদ্ধিহীন মেয়েটার বুদ্ধি যোগায় কে?

লেখাপড়ায় মন বসতে চায় না। উদাস ভাব। কিন্তু কীর্তনের নামে পাগল। বাপের সাথে সাথে কীর্তনে যেতেই হবে। কোন বাধাই মানবে না সে।

প্রতিবেশী চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে কীর্তনে এসেছে। কীর্তন শুরু হতেই ঘুমে ঢুলু ঢুলু। যেন ভাব হয়েছে। মহাশিশুর মহাভাব।

বিপিনবিহারী বললেন, 'ওরে ও নির্মলা! ঘুমাস কেন? কীর্তন শোন্।'

চোখের পাতা দুটি খুলে মৃদু মৃদু হাসে। কিন্তু আবার ঐ ভাব। তবুও শেষ পর্যন্ত থাকা চাই। কীর্তন শেষ না হলে উঠবে না সে। কীর্তন শোনা নয়, এ যেন দেবতার পায়ের নূপুরধ্বনি শোনা।

বৃদ্ধা আত্মীয়ার সাথে চানলাতে পাগলা শিব দেখতে এসেছে নির্মলা। বৃদ্ধা হলেন বিপিনবিহারীর দিদিমা। সাথে গ্রামের

লোকও কয়েকজন আছেন। চানলার শিব খুবই জাগ্রত। দূর-দূরান্তর হতে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসে এখানে লোকেরা। সর্বদাই লোক সমাগম হয়। সেদিনও ছিল খুব ভীড়।

ছোট্ট মেয়ে নির্মলাকে মন্দিরের বাইরে বসিয়ে রেখে সকলে গেছেন মন্দিরের অভ্যন্তরে। শিব দেখতে।

কিন্তু কোথায় শিব! শিব তো মন্দিরাভ্যন্তরে নেই। আশ্চর্যান্বিত হলেন পুরোহিত। মহান্ত। ব্যাকুল হয়ে উঠলো দর্শকদের মন। কোথায় গেলেন শিব! কোথায় শিব! সমস্বরে সকলেই চীৎকার করে ছোটাছুটি করতে লাগলো।

পর মুহূর্তেই এক অভাবনীয় দৃশ্য সকলে অবলোকন করলেন।

—ওগো, তোমরা সব দেখে যাও। এ কাদের বাড়ির মেয়ে গো! এ দেবী না মানবী! বিহ্বল হয়ে বলে উঠলো এক গ্রামের বধূ। হ্যাঁ, সত্যই। স্বপ্ন নয়। গল্প নয়। কবি-কল্পনাও নয়। এতগুলি গ্রামের মানুষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে,—সকলেই প্রাণভরে দেখলেন শিবঠাকুরকে। আর ঐ—সরলা। কমলা। হাস্যময়ী। খেওড়া গ্রামের ছোট্ট মেয়ে, নির্মলাকে।

মেয়েটি মৃদু মৃদু হাসছে। পাগলা শিবের পাগলামি দেখে। মন্দিরাভ্যন্তরের শিব তারই সম্মুখে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। মন্দিরের প্রস্তরীভূত শিব নয়। এ যেন জটাজূট-শোভিত, ধবল রজতগিরি-সদৃশ, ঐশ্বর্যভূষিত, প্রশান্ত মনোহর মূর্তি ধারণ করে স্বয়ং ঈশ্বর—উমাপতি, উ-মার সন্নিকটে বিরাজিত হয়েছেন।

ছুটে এলেন বৃদ্ধা। ছুটে এলেন গ্রামের মানুষেরা। পুরোহিত। মহান্ত। আরও যাঁরা এসেছিলেন দূর-দূরান্তর হতে। মন্দিরের মানুষেরা এসে ভীড় করলো, মন্দিরের বহির্ভাগে।

সেখানে বসে ছিল খেওড়া গ্রামের ছোট্ট মেয়ে নির্মলা।

বৃদ্ধা এসে কোলে নিলেন নাতনীকে। দাঁতহীন মুখ দিয়ে তার

২

কোমল গাল স্পর্শ করে আদর করতে লাগলেন। আনন্দাশ্রু নির্গত হতে লাগলো।

আর আদর করলেন প্রতিবেশী। প্রতিবেশিনীরা। আর দূর গ্রামের মানুষেরা।

পুরোহিত আর মহান্ত বিহ্বল কণ্ঠে শিবস্তব শুরু করে দিলেন।

দেবালয়ের মিলিত মানুষেরা অভিভূত হলেন এই অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন করে। বলাবলি করতে লাগলেন গ্রামের মানুষেরা,— আমরা ভাগ্যবান, তাই আজ হর-গৌরীর মিলন দর্শন করলাম। এ মেয়ে সামান্যা মেয়ে নয়। এ নিশ্চয়ই দেবী ভগবতীর অংশ।

* * *

এ কাহিনী শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন কন্যার পিতামাতা।

পাঁচ

নির্মলা এখন ছোট্ট শিশুটি নয়। দশ বৎসরের কিশোরী মেয়ে। রূপে অতুলনীয়। অনুপম রূপ নিয়ে সে যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে নবীন মেঘের খেলা দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে যায়, তখন ফুলের মধু আহরণে ব্যাপৃত ভ্রমরও হয় উদ্‌ভ্রান্ত। ভুল করে ছুটে আসে, সরলা নির্মলার মুখপদ্মের দিকে।

'এত রূপ! স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যেন অবতীর্ণা হয়েছেন আমাদের এই খেওড়া গ্রামে।' বলাবলি করে প্রতিবেশিনীরা।

সর্বদাই উদাস, অনাসক্ত ভাব। যেন দিব্যভাবের ভাবুক।

কিন্তু বাপমায়ের অন্যরকম ধারণা।

'এটা একেবারে সোজা। কিছুই বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। এর উপায় হবে কি?'

বাপমায়ের মন্তব্য শুনে মৃদু মৃদু হাসে নির্মলা। একদিন এক

কলসী জল পুকুর হতে নিয়ে কাঁখে করে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে বাপ-মা'কে সম্বোধন করে বলে,—'তোমরা যে সকলে আমাকে সোজা বলো এই তো আমি বাঁকা হয়েছি।'

সকলেই হেসে ওঠেন বোকা মেয়ের বোকামি দেখে।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীপূজা সবে সম্পন্ন হয়েছে। মোক্ষদাসুন্দরী মেয়েকে ডেকে বললেন, 'ওরে ও নির্মলা, ঠাকুর প্রণাম করে যা। প্রণাম করে বল্, ঠাকুর! তুমি আমার মঙ্গল করো।'

ঠাকুরের সামনে এসে কিশোরী মেয়ের হঠাৎ ভাবাবেশ হলো। উন্মনা হয়ে নীরব হয়ে রইলো। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। সব কিছুই গুপ্তভাবে হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো, —'ঠাকুর তোমার যাতে আনন্দ হয় তাই করো।'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রইলেন কন্যার মাতা-পিতা।

সংসারের অচল অবস্থা। তার উপর তিনটি সন্তানের অকাল মৃত্যুতে জননী মোক্ষদাসুন্দরী শোকমগ্না। কিন্তু প্রতিবেশীরা কোনদিন শোকাকুল জননীর ক্রন্দনধ্বনি পায় নি শুনতে। হাস্যময়ী কিশোরী নির্মলা, জননীকে পুত্রশোক হতেও রেখেছে ভুলিয়ে।

আনন্দের আধার আনন্দময়ী। জননীর মনোজগতেও আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করে দিয়েছে।

বয়সে কিশোরী হলেও, সে পূর্ণজ্ঞানী। তাই এই বয়সেও সে ভাবস্থ হয়। ভাবসমাধি। প্রেমোৎসুকা, কৃষ্ণ-বিহ্বলা গোপিনীদের যে ভাব হতো, সেই ভাব। শ্রীমতীর ভাব। রাধা ভাব।

কিশোরী মেয়ের মহাভাব হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে। হয়তো তখন রজনী গভীর। ঘুমিয়ে পড়েছে সমস্ত গ্রাম। শান্ত সমাহিত এক ভাব ধারণ করে আছে। নিস্তব্ধ চতুর্দিক।

কিন্তু দূর গ্রাম হতে বাতাসে ভেসে আসছে কীর্তনের সুমধুর সুর। সুরধ্বনি নয়। সুমধুর সঙ্গীতের সুরও নয়। এ যেন কৃষ্ণের বাঁশীর সুর। বাঁশের বাঁশীর সেই মর্মান্তিক সুর। যে সুর শুনে একদিন

কুলবধূ আঁচলে চোখ মুছতো। সন্তানহারা জননীর মর্মে মর্মে বিলাপের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হতো। পথে চলতে চলতে পথিক থমকে দাঁড়াতো। আর পথ যেতো ভুলে। কলসীর জল ফেলে কুলবধূ আবার যেতো জল আনতে। সেই সুরের মর্মান্তিক করুণা ও বিলাপ শুনে, মায়ের কোলে ছোট্ট শিশুও চাইতো না ঘুমাতে। সেই সুর আজ কিশোরী নির্মলাও শুনতে পেয়েছে। কৃষ্ণের বাঁশী আজও বেজে চলেছে। জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর বাঁশী আজও চলেছে বেজে। কিন্তু সকলে পায় না শুনতে। যার কান আছে, আর আছে ভাব—মহাভাব—সেই পায় শুনতে। এ যে ঘুম ভাঙার কূল ভাঙার সুর। কিন্তু এ সুরে আছে এক অলৌকিক পরমানন্দের আভাস। তাই তো তার চোখেও নেই ঘুম।

নিদ্রামগ্ন পিতা-মাতা। নিদ্রিত সমস্ত গ্রাম। কিন্তু অতন্দ্রিত সে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে শুনছে কৃষ্ণের বাঁশীর সেই মর্মান্তিক সুর। চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছে। শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থা। ক্রমে ক্রমে শরীর অবশ ও অসাড় হয়ে পড়লো।

এইভাবে গভীর রজনীতে লোকচক্ষুর অন্তরালে কিশোরী মেয়ে নির্মলা ভাবস্থ হয়ে থাকতো, যতক্ষণ না রাত্রি প্রভাত হতো।

ছয়

এই স্বপ্নময় কৈশোরের মাঝখানে নির্মলার বয়স যখন বারো বছর দশ মাস, তার জীবনে এলেন স্বামীরূপে ভোলানাথ।

১৩১৫ সালের ২৫শে মাঘ, ঢাকা বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীজগদ্বন্ধু চক্রবর্তী ও ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর তৃতীয় পুত্র শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তীর সহিত শুভ বিবাহ ক্রিয়া হলো সম্পন্ন।

এই রমণীমোহনই পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে 'ভোলানাথ' এবং পশ্চিম ভারতে 'রমা-পাগলা' নামে হলেন খ্যাত।

বিবাহের পরে শ্বশুর মাত্র বছর দুই ছিলেন জীবিত। শাশুড়ী পূর্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করেছিলেন।

অকস্মাৎ স্বামীও হলেন কর্মচ্যুত। নিরালম্ব অবস্থা। সুতরাং নির্মলার বধূ জীবনের শিক্ষানবিশী চলতে লাগলো ভাসুর রেবতী-মোহনের অন্তঃপুরে।

রেবতীমোহন তখন ঢাকা জগন্নাথগঞ্জ লাইনে শ্রীপুর, নরুন্দী প্রভৃতি স্থানে স্টেশন মাস্টারের পদে ছিলেন নিযুক্ত।

এইখানে রেবতীমোহনের সংসারে ভ্রাতৃজায়ারূপে দীর্ঘ চার বৎসর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্মলা, নির্মলাসুন্দরী, জগৎজননী রইলো লুকিয়ে। আত্মগোপন করে রইলো স্টেশন-সংলগ্ন ছোট্ট একটি রেলওয়ে কোয়ার্টারে।

বধূত্বের অভিনয় হতো সর্বাঙ্গসুন্দর। কুলবধূর পালনীয় সকল নিয়ম ও আচার পালন করতো সে, আনন্দিতচিত্তে।

সংসারের কাজে ব্যাপৃত থাকলেও, কৃষ্ণের বাঁশীর সেই মর্মান্তিক সুর তখনও তার কর্ণগোচর হতো। এই বাঁশীর সুরে তাকে আবার করে তুলতো ভাবস্থ। হয়তো বা রান্নার কাজে ব্যাপৃত আছে, এমন সময় অতি অকস্মাৎ এল এই ভাবান্তরের স্রোত।

প্রতিবেশিনীরা বলতো, 'এই বৌটির বুদ্ধিশুদ্ধি নেহাৎ কম।'

কুলবধূর ভাবের আবেশ হয়।

কৃষ্ণের বাঁশীর শুধুমাত্র সুরধ্বনি নয়। এ যেন দেবতার আহ্বান। প্রেমিক কৃষ্ণ তাঁর প্রিয়াকে করছেন আহ্বান। এ তো কূল ভাঙার আহ্বান।

পদ্মার ঢেউয়ে যেমন কূল ভেঙে পড়ে। তারও তো কূল তেমনই পড়ছে ভেঙে। কিন্তু সে তো শুধুমাত্র কুলবধূ নয়। সে যে উন্মাদিনী রাধা। কৃষ্ণ প্রেমে ব্যাকুল তার অন্তর। আকুল হয়ে ডাকছে,

কোথায় কৃষ্ণ! দেখা দাও। দেখা দাও। ভুলে যায় সে রেবতীমোহনের ভ্রাতৃজায়া। রমণীমোহনের গৃহবধূ।

তাই তো ভাবমগ্ন হয়ে জ্বলন্ত উনানের পাশেই নির্জীবের মত ঢলে পড়ে যায়। উনানে চড়ানো ডাল, তরকারী পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

সকলে মনে করলো, ঘুম। বউ বড় ঘুমায়।

পরে মাঝে মাঝেই যখন এরূপ ভাবের আবেশ হতে লাগলো, তখন সকলে মনে করলেন, এ এক প্রকারের রোগ এবং ঔষধেরও করলেন ব্যবস্থা।

কিন্তু রোগের আসল মূলটি যেখানে, ততদূর পর্যন্ত কোন রকম ঔষধের ক্রিয়াই পৌঁছালো না। ফলে রোগ দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলো।

পৃথিবীর মানুষের স্থূলদৃষ্টিতে কিছুই পড়লো না ধরা। এ মেয়ে যে সামান্যা মেয়ে নয়। কুলবধূও নয়। চিরজ্যোতির্ময়ী। হাস্যময়ী। নীলিম আকাশের মত নির্লিপ্ত। নির্মুক্ত। উদাসীন। ভাগবতী ঐশ্বর্য নিয়ে জীবের কল্যাণের জন্য হয়েছেন অবতীর্ণা। এই পৃথিবীর মাটিতে। মানবলোকে।

তাই তো একা ঘরে স্বামী নবপরিণীতা বধূর সান্নিধ্যে এসে দেখলেন তিনি এক অলৌকিক ভাবে যোগাসনে আছেন বসে। যখনই তিনি নববধূর কাছে আসবার চেষ্টা করতেন তখনই বোধ করতেন কি একটা অস্পষ্ট অথচ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান যেন উভয়ের মাঝখানে প্রাচীরের মত রয়েছে দণ্ডায়মান।

সাত

নির্মলা এখন সতেরো বছরের যুবতী। রূপবতী কুলবধূ। হঠাৎ ভাসুর মারা গেলেন। তাই চলে এলেন স্বামীর কর্মস্থলে। অষ্টগ্রামে।

নিজের সংসারে। ক্ষুদ্র সংসারে আবদ্ধ হতে নয়, এ যেন বিশ্বজননী এলেন বিশ্বের ঘরে।

ঈশ্বর-তৃষ্ণা পেয়ে বসেছে নির্মলাকে। ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষার তীব্রতা দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলো। মধুর ভাবের সাধনা। কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণের স্পর্শের জন্য, কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজ-গোপাঙ্গনাদের আকুলতা। এ যেন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বলা রাধা।

শুধু নাম শুনেই মন প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ইহসংসার ভুলেছে। সাংসারিক ক্লান্তি, অবসাদ দূর হয়েছে। এক অলৌকিক পরমানন্দের আভাস পেয়েছে। এখনও দর্শনলাভ হয় নাই। স্পর্শ না জানি কিরূপ! কবে সে অমৃতসাগরে করবে অবগাহন।

কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় তন্ময় হয়ে আছে সে। বিরহ। তাঁকে সেই পরমপুরুষকে গভীর নিবিড় করে পাওয়ার জন্যই তো বিরহ। আনন্দময়ী বিরহিনী রাধা। মধুর ভাবের সর্বস্বত্বাধিকারিণী রাধারাণী। মহাভাবভাবিনী। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীই তো রাধিকারূপে ধরাধামে অবতীর্ণা হয়েছিলেন, বিষ্ণু অবতার কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে সেবার জন্য।

এক সময় দুর্দান্ত অসুর কালনেমি, কংসরূপে ধরাধামে জন্মগ্রহণ ক'রে, কলুষিত করে তুললো ধরিত্রীমাতাকে। কংসের পাপকর্মে পৃথ্বী কাতরা হয়ে গোরূপ ধারণ করে করুণ স্বরে ক্রন্দন করতে করতে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হয়ে আপন দুর্ভাগ্যের কথা করলেন নিবেদন। ধরিত্রীর দুঃখ শ্রবণ করে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা দেবগণসহ ক্ষীর সাগরের তীরে উপস্থিত হয়ে পুরুষাবতার জগন্নাথকে উপাসনা করতে লাগলেন। নিখিলেশ্বর ধরণীর দুঃখ জানতে পেরে, পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবাসুদেব, কৃষ্ণরূপে বসুদেব গৃহে স্বয়ং হলেন আবির্ভূত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য নারায়ণী, ভগবতী স্বয়ং রাধিকা-রূপে পৃথিবীতে অগ্রেই হলেন আবির্ভূতা। বৃন্দাবন হলো তাঁর

লীলাক্ষেত্র। কংস নিহত হলো। বিষ্ণুমায়ায় জগৎ হলো মুগ্ধ। পৃথিবীতে আবার ফিরে এল শান্তি।

সেই বৃন্দাবনে, মথুরার মধুপুরীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান। আজও কৃষ্ণের বাঁশী বেজে চলেছে। কৃষ্ণ বংশীবাদন করে কৃষ্ণচিন্তানিরতা কামিনীদের আহ্বান করেন। বংশীর সুরধ্বনি নয়। ভগবানের আহ্বান।

নির্মলা তার জীবনের প্রতিপদক্ষেপে শুনতে পায় ভগবানের সেই আহ্বান সঙ্গীত। তাই তো সে তার দেহ, মন, আত্মা, সর্বস্ব সেই পরমাত্মা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পায়ে সমর্পণ করে হতে চায় মুক্ত।

ব্রজগোপাঙ্গনাদের মত সেও রসাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করে পরমানন্দ করতে চায় উপভোগ। সে যে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধারাণী।

'মেয়ে হয়ে না জন্মালে সে এমন তদ্‌গতপ্রাণা হয়ে কি আর পরমপুরুষকে ভজনা করতে পারতো!' মনে মনে বলে নির্মলা।

কীর্তনে এসেছে নির্মলা। অষ্টগ্রামে গগন রায়ের কীর্তন। নামগান। কৃষ্ণনাম। দূর গ্রামের মানুষেরাও এসেছে। কীর্তন হলো শুরু।

সুমিষ্ট কণ্ঠে গগন রায় গাইলো—

> সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
> কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলো গো—
> আকুল করিল মোর প্রাণ,—
>
> *　　*　　*
>
> জপিতে জপিতে নাম অলস করিল গো—

যোগীর মত চক্ষু মুদ্রিত করে কৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপন করে পুলকিত শরীরে পরমানন্দে মত্ত হয়ে রইলো নির্মলা। রাধারাণীর ভাব। নিজেকে রাধারাণী মনে করে, রসাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় নিমগ্না হয়ে রইলো সে।

প্রিয়বিরহ-মোহিতা রাধারাণী। ভাবস্থ হলো। মহাভাব। ভাব-সমাধি।

অষ্টগ্রামের মানুষেরা জানলো। দেখলো। কৃষ্ণ-কীর্তনে আনন্দ-বিহ্বলা স্বয়ং রাধারাণী অধিষ্ঠিতা রয়েছেন।

কুলবধূ নির্মলা সামান্যা বধূ নয়। এত রূপ! রূপ যেন ফেটে পড়ছে। কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীমতীরই ছিল এমন রূপ!

অষ্টগ্রামের ধনী মানুষ ক্ষেত্রবাবু ভাব-বিহ্বলা নির্মলার রূপে মুগ্ধ হয়ে 'দেবী' বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

গ্রামের বধূ নির্মলার ভাব-সমাধির কথা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পড়লো ছড়িয়ে।

বিশ্বের জননী যিনি, তাঁকে অখ্যাত কুটিরের রুদ্ধদ্বার কক্ষে চিরদিন কি লুকিয়ে রাখা যায়?

আট

'মা, মাগো! তুই শুধু আমার মা নয়। তুই জগতের মা। জগদ্বাসিনী। দেবী ভগবতী।' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে হরকুমার রায়। অষ্টগ্রামের শ্রীজয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের শ্যালক। পাগল। সাধারণ পাগল নয়। ধর্মপাগল। ভগবৎ ভাবের উন্মাদ। সেই জন্য চাকুরীও স্থায়ী হয় না। কোথাও স্থায়ীভাবে বাসও করে না। অষ্টগ্রামে ভগিনীর বাড়িতে আছে। ভোলানাথের প্রতিবেশী।

ভোলানাথের ঘর আলো করা বধূ নির্মলাকে দেখলো হরকুমার। কি রূপ! রূপ যেন ফেটে পড়ছে। কি সুন্দর দুটি চোখ! কমললোচন। এ তো মানবী নয়। এ দেবী ভগবতী। 'যয়া সম্মোহিতং জগৎ'। যার দ্বারা জগৎ মুগ্ধ হয়।

মা। মা যে অদ্বিতীয়া। যেখানে দ্বিতীয় বলে কেউ নেই

সেখানে তো আবরণের কথা ওঠে না। কোথায় আবরণ! দৃষ্টির সম্মুখে জ্যোতির্ময়ী মূর্তি বিশ্বজননীর।

কুলবধূ নির্মলাকে মা বলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হরকুমার। নির্মলার একমাথা ঘোমটা। লজ্জায় সঙ্কুচিতা।

'কিন্তু এ কাকে দেখলাম! এত সময় ধরে!' নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে বসে হরকুমার। সর্ববর্ণময়ী, পরব্রহ্মরূপিণী মাতৃমূর্তিই তো নয়নগোচর হলো। তখন কোন আবরণ ছিল না। মাথায় ঘোমটাও তো ছিল না। এ স্বপ্ন নয়। সত্য।

ছলনাময়ী মা, আর ছলনা করিস না। ঘোমটা তোল্। ছেলেকে দেখ্। কথা বল্।

'ছেলের কাছে মায়ের লজ্জা'—এ আবার কি কথা!

হরকুমারের সন্তানভাব। বাৎসল্য রস। সর্বদাই নির্মলাকে আকুল হয়ে 'মা'—'মা' বলে ডাকে। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় 'মা' ব'লে গড় হয়ে প্রণাম করে। হরকুমার 'মা' বলে নির্মলার যত কাছে আসে, লজ্জায় নির্মলা ততটা দূরে যায় সরে। কিন্তু হরকুমারও নাছোড়বান্দা। এ যেন মাতৃহারা শিশু আবার ফিরে পেয়েছে তার মা-কে।

কিন্তু হরকুমারের ক্ষুধার হয় না নিবৃত্তি। ক্ষুধা। আরও ক্ষুধা। যাকে মা বলে ডেকেছি, সেই মায়ের প্রসাদও তো চাই। এ তো আর সামান্যা মা নয়। জগন্মাতা। যশোদা মা। গোপালের মা। বাৎসল্য রসের সুরধ্বনি। তাই তো সে নির্মলার আহারের সময় এসে উপস্থিত হয়। প্রসাদের আশায়। প্রসাদ তার চাই-ই। প্রসাদ না নিয়ে সে মায়ের কাছটি হতে উঠবে না।

পাগল ছেলের পাল্লায় পড়েছে নির্মলা। ভীষণ সমস্যা। লজ্জায় মাথার ঘোমটা আরও দেয় টেনে। গলা পর্যন্ত। একগলা ঘোমটা নিয়ে খেতে বসে সে। কিন্তু খাওয়া আর হয় না।

অবশেষে ভোলানাথই আদেশ করেন নির্মলাকে।—'ওর যখন

এতটা আগ্রহ, তুমি একটু কিছু খাওয়ার সময় দিয়ে দিলেই পারো।'

ভোলানাথের আদেশে যেন মায়ের স্নেহধারা বর্ষিত হলো সন্তানের উপর।

নির্মলা প্রসাদ দেয় হরকুমারকে। হরকুমার গ্রহণ করে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে শিশুর মতো নেচে ওঠে। আনন্দবিহ্বল কণ্ঠে বলে,—'তোকে কেউ চিনলো না। তুই জগতের মা। একদিন সারা জগতের লোক তোকে 'মা' বলে ডাকবে। দেখবি।'

সদানন্দময় হরকুমার ভাল কীর্তন গায়। নির্মলার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তুলসীতলাটি দেখে, হরকুমারই সর্বপ্রথম কীর্তনের বন্দোবস্ত করে।

ভাবোন্মাদে উন্মত্ত হয়ে হরকুমার গেয়ে ওঠে,

—না জানি কতেক মধু,
শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

এই পাগল। বদ্ধ পাগল। হরকুমারই প্রথম নির্মলার সুপ্ত মাতৃভাবকে তুলেছিল জাগিয়ে। 'মা'-ডাকের মাধুর্য সে জীবনে প্রথম করেছিল উপলব্ধি।

নয়

নির্মলা এখন বাজিতপুরে। ভোলানাথ সেটেলমেণ্টে চাকুরী করেন। বদলি হয়ে এসেছেন।

আজকাল প্রায়ই ভাবোন্মাদে উন্মত্ত হয়ে যায় নির্মলা। ভাব-সমাধি হয়। কীর্তনে। নামগানে। কোথাও কৃষ্ণ গুণগান হলেই হলো। শুনতে শুনতে নির্মলা কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপাঙ্গনাদের মত আনন্দবিহ্বলা হয়ে যায়। অন্তরের অন্তস্তলে ডুব দিয়ে বিরহানন্দ উপভোগ করে সে।

বাজিতপুরের শ্রীযুত ভূদেবচন্দ্র বসুর ছোট মেয়ে 'সুজাতা'—খুবই অসুস্থ। গৃহে নামগান হবে। কৃষ্ণনাম। লোকসমাগম হয়েছে। নির্মলাও এসেছে। নির্মলা ভূদেববাবুর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর খুবই প্রিয়। ছেলেমেয়েরাও নির্মলা ভিন্ন জানে না। অসুস্থ মেয়ের বিছানায় বসে আছে নির্মলা। কীর্তন শুরু হয়েছে—

হরি হরয়ে নমঃ
কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ—

কৃষ্ণ নামে মুখরিত চতুর্দিক। যেন সমস্ত জগৎ সংসার কৃষ্ণময় হয়ে উঠেছে। ধ্যানস্থ হলো নির্মলা। এক অলৌকিক ভাবে বিভোর। ভাবের আবেশ নয়। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আবেশ। তারই দেহে। মনে। আত্মায়। ব্যবহারিক জগতের ঊর্ধ্বে। দূরে। বহুদূরে। অসীমে। অনন্তে। পরমব্রহ্মে লীন হয়ে গেল সে। আনন্দ। পরমানন্দ। দেহে। মনে। এক নির্মল প্রশান্তি উপভোগ করতে লাগলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য হৃদয়ের স্পন্দনও হলো রুদ্ধ। শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থা। বিছানা হতে নিচে, মাটিতে পড়ে গেল। চৈতন্য হারিয়ে ফেললো।

আত্মানুভূতির শুভ্র আলোক-ছটায় তখন তার মানবীরূপ জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তিতে হলো রূপান্তরিত।

ছুটে এলেন ভূদেববাবুর স্ত্রী। আরও সকলে। অভিভূত হলেন সকলে নির্মলার দেহলতিকার সৌন্দর্য দর্শন করে। এই চিৎসত্তাস্বরূপিণী পরমানন্দময়ী যেন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের রূপেরই প্রতিচ্ছায়া।

কিছু সময় মাত্র। আবার ফিরে এল নির্মলা। লৌকিক জগতে। পরমব্রহ্ম হতে, ব্রহ্মশক্তিতে। জীবজগতে। পরমাত্মা হতে আত্মাতে। ধীরে ধীরে উন্মীলিত হলো তার চোখের পাতা দুটি।

আশ্বস্ত হলেন ভূদেববাবু। ভূদেববাবুর স্ত্রী। প্রতিবেশী। উপস্থিত আরও সকলে।

ভোলানাথের আকুলতা হলো প্রশমিত।

আবার শুরু হলো কৃষ্ণনাম। কীর্তন।

—অনুখন মাধব মাধব সুমরইত।

সুন্দরি ভেলি মধাই

এই ঘটনার কথা জানলো বাজিতপুরের সমস্ত লোকেরা।

কিন্তু বাজিতপুর জানলো না। চিনলো না। রাধারাণীর আধার নির্মলাকে। মহাশক্তিরূপিণী মহামায়াকে। আনন্দবিলাসিনী কুমুদিনীকে। জগতের জননীকে।

বিচারবিরহিত সাধারণ মানুষেরা অজ্ঞতা-বশত এই অবস্থাকে ভূত, প্রেত বা ক্ষুদ্র দেবতার আবেশ বলে করলো প্রচার।

অবশেষে দোষারোপ করলো ভোলানাথকে। ওঝা দেখানো উচিত। চিকিৎসার প্রয়োজন। প্রতিবেশিনীরা নির্মলার সাথে মেলামেশাও বন্ধ করলো। ভয়ে। অমঙ্গলের আশঙ্কায়।

পরবর্তী জীবনে একদিন মা বলেছিলেন,—'বাজিতপুরের এই অবস্থা হওয়ার পূর্বে আমাকে সকলেই খুব ভালবাসিত। সর্বদাই আমার কাছে আসিত। কিন্তু এই অবস্থা আরম্ভ হইলে আমাকে ভূতে পাইয়াছে ভাবিয়া সকলে আসা বন্ধ করিল। ভালই হইল। আমি একান্ত পাইয়া আপন মনে বসিয়া ডাকিতাম। সবই যেন ঠিক ঠিক মত হইয়া গিয়াছে।'

অবশেষে ভোলানাথ বাধ্য হয়ে দুই একজন ওঝাকে দিয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সবই বৃথা।

জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি দর্শন করে, তারা 'মা'—'মা'—চীৎকারে প্রতিধ্বনিত করে তুললো গৃহাভ্যন্তর। একজন ওঝা তো ভীত হয়ে চৈতন্য হারিয়ে ফেললো।

তখন ভোলানাথ ব্যাকুল হয়ে নির্মলাকে বললেন, 'ওগো, যাতে এরা সুস্থ হয় তাই করো।'

তখন ক্ষমা সর্বদেবময়ী, ভক্ত-প্রাণরূপা মূর্তিমতী কৃপা, ত্রিলোক-তারিণী মায়ের ইচ্ছায় ওঝা দুটি সুস্থ হয়ে উঠলো।

যাওয়ার সময় ওঝা দুজন বলে গেল, 'এ সব আমাদের কাজ নয়। ইনি সাক্ষাৎ দেবী।'

বিচিত্র এই দুনিয়া। বিচিত্র এই দুনিয়ার মানুষ, মনুষ্য সমাজ। অবিদ্যারূপিণী মোহিনীমায়ায় মোহাচ্ছন্ন সকলে।

সংবাদ পৌঁছালো নির্মলার পিত্রালয়ে। বিদ্যাকূটে। বিপিন-বিহারী এতদিনে ফিরে এসেছেন স্বগ্রামে। মোক্ষদাসুন্দরী বিচলিত হলেন। কোলে তাঁর ছেলে মাখন।

বিপিনবিহারী বোঝালেন, 'চঞ্চল হয়ো না। ছেলেকে দেখ। এসব দুঃসংবাদ নয়। সুসংবাদ। নির্মলার দেহে ভূতের আবেশ হয় নি। এসব দিব্যোন্মাদনা। সাধারণ মানুষের বুঝবার জিনিস নয়। আমি আজই নামগানের ব্যবস্থা করছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দিব্যদ্রষ্টা পিতা বিপিনবিহারী শান্ত করলেন, বিচলিতা স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরীকে। স্বামীর কথায় আশ্বস্ত হলেন মোক্ষদাসুন্দরী।

—'ভাল করে একবার দেখুন তো?'

কালীকচ্ছের ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দীর কাছে নির্মলাকে নিয়ে এসেছে ভোলানাথ।

'এ কি উন্মাদ, না স্নায়ুবিকার? রাতে এক ফোঁটা ঘুম নাই। কখনও ঘরের মেঝেতে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। কখনও আবার উপুড় হয়ে প্রণামের ভাবে থাকে, আর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় ওঁ ওঁ শব্দ। কয়েক মুহূর্ত, কয়েক মিনিট নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সমস্ত রাত্রি। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। লোকের কথায় অনেক রকমই তো করলাম। কিছুই হলো না। এখন আপনি দেখুন। ভাল করে দেখুন।'

মহেন্দ্র নন্দী দেখলেন। ভাল করেই দেখলেন নির্মলাকে। তারপর ভাবতে বসলেন।

নির্মল চরিত্র। সত্যবাদী। দিব্যদ্রষ্টা ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দী বুঝলেন রোগের মূল কোথায়।

ভোলানাথকে বললেন, 'এসব খুব উচ্চ অবস্থা। ব্যারাম নয়। আপনি যাকে-তাকে দেখাবেন না।'

এর পর ভোলানাথ আর কাউকেও দেখাতেন না।

দশ

তেরশো উনত্রিশ সালের শ্রাবণ মাসে ঝুলন পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষা অলৌকিকভাবে হয়ে গেল। লোকাচার অনুযায়ী নয়। কোনও গুরুর মন্ত্র বিভূতিতেও নয়। স্বতঃস্ফুরিত ভাবে।

দেহে যৌগিক ক্রিয়াদিও প্রকাশিত হলো। এক অপ্রাকৃত ভাবের ঘোরে দিন হতে লাগলো অতিবাহিত। এই দৈবী প্রভাতের স্ফুরণের সাথে সাথে তাঁর বাকশক্তিও হলো রহিত। শুরু হলো মৌনাবলম্বন। সচ্চিদানন্দের অনুভূতির দিব্যপ্রভায় তাঁর মুখশ্রী অপরূপ শোভায় শোভিত হয়ে উঠলো।

দৃষ্টির স্নিগ্ধতা। ললাটের প্রশান্ত ঔদার্য। মুখের পবিত্র কমনীয়তা। দেহভঙ্গীর নমনীয়তা যেন কোন্ এক গোপন উৎস হতে এসে তাঁর সমগ্র দেহলতিকাকে দিব্যজ্যোতিতে করে তুললো উজ্জ্বল। এ যেন পবিত্রতার জীবন্ত এক মূর্তি। যেন জ্যোতির্ময়ী দেবী মহাদেবী, ভগবতী অলৌকিক মাধুর্য নিয়ে মানবীরূপে ধরাধামে হয়েছেন অবতীর্ণা।

'এই সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের শরীরে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস কাল ধরে নানা দেব-দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি জীবন্ত শরীরধারী কত দেব-দেবীর দর্শন পেয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নাই। তিনি তাঁদের পূজা

করতেন। পূজান্তে আবার তাঁরা তাঁর দেহমধ্যে বিলীন হয়ে যেতো। বাহনাদিসহ এক দেবতার পূজা সমাপন হলে অন্য দেবতার আবির্ভাব হতো। পূজা আরত্রিকের সময় তিনি অনুভব করতেন তিনি নিজেই দেবতা। নিজেই পূজক, নিজেই তন্ত্রধার। তিনিই মন্ত্র। তিনিই পূজার জল। ফুল। নৈবেদ্যাদি উপকরণ। পূজাদিতে কোনও বাহ্যিক উপচারাদি ছিল না। কিম্বা তিনি নিজের কোন ইচ্ছাতেও ঐ সকল ক্রিয়া করেন নাই। একান্তে বসিলেই স্বাভাবিক ভাবে পূজাদির যথাযথ দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াগুলি শরীরের উপর আপনা আপনিই হয়ে যেতো। পরে ক্রিয়াবিৎ লোক হতে জানা গেছে যে মণ্ডল, যন্ত্রাদি অঙ্কন হতে আরম্ভ করে মন্ত্র, যাগ, যজ্ঞাদি সকল অনুষ্ঠানই শাস্ত্র-সম্মতভাবে সম্পন্ন হতো।'

এই বিষয়ে মা-কে কেহ প্রশ্ন করলে মা বলতেন, 'আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না, জানবার সময় হলে জানতে পারবে।'

*　　　*　　　*

সারা রাত্রি ধরে শ্রীশ্রীমায়ের দেহে এক অত্যদ্ভুত ভাবের বিচিত্র তরঙ্গ খেলা করতো। ভোলানাথ নিজ শয্যায় শুয়ে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে এই খেলা দেখতেন। অতিমানবীয়, অলৌকিক নাট্যের একমাত্র দর্শকরূপে গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে তিনি হতেন আতঙ্কিত।

একদিন রাত্রিতে শ্রীশ্রীমা বিছানায় বসে আছেন। ভোলানাথ পাশে নিদ্রিত। হঠাৎ নির্মলা অনুভব করলেন, তাঁর শরীর যেন ফুলে মোটা হয়ে যাচ্ছে। দেহে অসাধারণ শক্তি হচ্ছে অনুভূত। অবলা, কমলা, অসহায়া নারীর শক্তি নয়। কোমল ফুলদল দিয়ে গড়া রূপসী সুতন্বীর দৈহিক বলও নয়। পুরুষের শক্তি। পুরুষপ্রবর পুরুষোত্তমের শক্তি, নিজ দেহে হচ্ছে অনুভূত।

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আবেশ।

বিশ্বজননীর মহাভাব। ভাবে হয়ে রইলেন বিভোর। এই অবস্থায় হঠাৎ তাঁর একখানি হাত ভোলানাথের গায়ে পড়ে যায়। ভোলানাথ

ঐ ভারী হাতের স্পর্শে চমকে জেগে ওঠেন। অন্ধকারে পুরুষের হাত মনে করে 'চোর চোর' বলে চীৎকার করে ওঠেন। নির্মলা তখন তাঁকে শান্ত করেন। তাঁর মুখ হতে সব কিছু শুনে ভোলানাথ তখনকার মত হলেন নিশ্চিন্ত।

১৫ই অগ্রহায়ণ। ১৩২৯ সন। ভোলানাথ দীক্ষা গ্রহণ করবেন। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হতে। দিন। ক্ষণ। তিথি। নক্ষত্র। মনে মনে সব কিছুই স্থির করে রেখেছিল নির্মলা। ঐ তিথিতে। মন্ত্র গ্রহণ করবার জন্য তিনি ভোলানাথকে বলেও রেখেছিলেন। কিন্তু ভোলানাথের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তাই তিনি ঐ দিন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কাছারীতে উপস্থিত হয়ে কর্ম-কোলাহলের মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রান্ত করতে লাগলেন।

কিন্তু যিনি সকল ইচ্ছারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী, মহাশক্তিরূপা চিদানন্দময়ী জননী, যিনি পূর্ণা, পরাৎপরা, সনাতনী, যিনি রহস্যরূপা, রসময়ী, প্রেমঘন বিগ্রহা, সেই মহামায়া বিশ্বজননীর ইচ্ছাই হলো পূর্ণ।

নির্দিষ্ট সময়ে শ্রীশ্রীমা ডেকে পাঠালেন ভোলানাথকে। ভোলানাথের কোন আপত্তিই তিনি শুনলেন না।

এই ভাবাতীতা মহাভাবরূপিণী রহস্যময়ীর অপ্রতিহত প্রভাবে প্রভাবান্বিতা হয়ে, ভোলানাথ মোহাচ্ছন্নের মত কাছারী হতে চলে এলেন গৃহে।

গৃহে এসে দেখলেন শ্রীশ্রীমায়ের ভাবোন্মাদনায় বিহ্বলতার অনির্বচনীয় এক মূর্তি। মুখ হতে উচ্চারিত হচ্ছে বেদমন্ত্র। সেই অলোকসামান্যা ভাবঘন মূর্তি তাঁকে করে ফেললো মোহমুগ্ধ। শ্রীশ্রীমা তাঁকে নির্দেশ দিলেন স্নান করে আসতে। ভোলানাথ স্নান করে এলে, 'মা' তাঁকে পরিয়ে দিলেন নববস্ত্র। তারপর তাঁকে ধরে বসিয়ে দিলেন পিঁড়িতে। ভোলানাথ মোহাচ্ছন্নের মত বসে রইলেন পিঁড়িতে।

পূজার উপকরণ সব কিছুই ছিল প্রস্তুত।

শ্রীশ্রীমা পূজা করলেন ভোলানাথকে। দেবাদিদেব—মহাদেবকে। ভবভয়হারী শ্রীহরিকে। পীত কৌষেয়ধারী প্রদীপ্তকৌস্তুভশোভিত নারায়ণকে। পুরুষপ্রবর পুরুষোত্তম পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে।

'হে সর্বদেবময়, আমা হতেই তুমি। এক আমিই বিশ্বজগৎ। তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং নিখিল ভাবনায়ক। তুমি আবির্ভূত হও। তুমি নিখিল বীজস্বরূপ এবং তুমিই সেই জল যাতে আমি অবস্থান করছি। বেদসমূহের তুমিই প্রতিষ্ঠাভূমি। তুমিই কামকামেশ্বরীরূপ দিব্যমিথুন। তুমি ভবভয়নাশকর। আমি তোমার শরণাগত। তুমিই আমার আশ্রয়। তুমি আমাকে তোমাতে আকর্ষণ কর। আমি একাধারে মহামায়া এবং মহাভাবময়। যে আমা হ'তে রুদ্রের রুদ্রত্ব, সেই আমি কার্যকারণাত্মক রুদ্রকে স্তুতি করি।'

যস্যা রুদ্ররুদ্রত্বং প্রণবে রাং ঋং
কৃতকারণং রুদ্রং নৌমি।

তারপর শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হতে বীজমন্ত্র হলো উচ্চারিত। মা ভোলানাথকে বললেন সেই মন্ত্র। ভোলানাথ মন্ত্র গ্রহণ করলেন শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হতে।

ভোলানাথের জ্ঞানচক্ষু হলো উন্মীলিত। জানলেন, চিনলেন, তাঁর বিদ্যারূপিণী স্ত্রী নির্মলাকে, মায়ারূপিণী শক্তিরূপে নির্মলাকে নয়ন-গোচর করে তিনি হলেন ধন্য।

এগার

নির্মলা এখন ঢাকায় শাহবাগে।

আর সেই লজ্জাশীলা কুলবধূ নির্মলা নয়। মাতৃরূপিণী, আনন্দ-বিলাসিনী কুমুদিনী। আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অনন্যপ্রেমা রাধারাণী।

শ্রীশ্রীমা।

শাহবাগের মা। শুধুমাত্র ধর্মপাগল হরকুমারের মা নয়। জগন্মাতা। অম্বিকা। জগৎজননী। কুলবধূর মত সলজ্জভাব। মাথায় বড় ঘোমটা। চওড়া লালপাড়ের শাড়ি। বড় সিঁদুরের ফোটা। ঘর গৃহস্থালীর নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম সব কিছুই আছে। কিন্তু তারই সাথে আছে নির্লিপ্ত নিরাসক্ত উদাসিনীর ভাব।

মুখমণ্ডলে এমন একটি স্বর্গীয় স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। ছলছলে চোখ দুটিতে এমন একটি ভাব-বিহ্বলতা। মনে হয় যেন তাঁর মধ্যে বিশ্বের সমস্ত মাধুর্য তরল হয়ে পড়ছে ঝ'রে। কখনও মনে হয় সাধারণ মানুষের মত হাসিখুশি ভাব। আবার কখনও আত্মবিস্মৃত বিহ্বলতায় যেন অন্য একজনের ভাবমূর্তি।

এই শাহবাগেই শ্রীশ্রীমা এক অনির্বচনীয় মহাভাবের প্রেরণায় আত্মহারা হয়ে বিভোর অবস্থায় কখনো প্রহরের পর প্রহর পড়ে থাকতেন।

সব সময়ই একটা তন্ময়তা ভাব। গৃহকাজ করতে করতে হঠাৎ অবশ হয়ে পড়ে যান। ঐ অবস্থাই পড়ে থাকেন। আবার প্রকৃতিস্থ-ভাব ফিরে এলে অসম্পূর্ণ কার্য সম্পূর্ণ করেন।

২৮শে চৈত্র। ১৩৩০ সন।

ভোলানাথ ঢাকায় এসেছেন চাকুরীর সন্ধানে। শ্রীশ্রীমাও এসেছেন তাঁর সাথে।

অনেক চেষ্টার পরও যখন চাকুরীর সন্ধান মিললো না, তখন ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলেন। কিন্তু 'মা' দিলেন বাধা। শ্রীশ্রীমা মৃদু হেসে ভোলানাথকে বললেন আরও তিন দিন অপেক্ষা করতে। অগত্যা ভোলানাথ মেনে নিলেন শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের কথা। আরও তিন দিন রইলেন ঢাকায়।

জগজ্জননীর ইচ্ছাই হলো পূর্ণ।

ঠিক তিন দিনের দিন, ১৩৩১ সালের ৩রা বৈশাখ, শাহবাগে,

নবাবদের বাগানের তত্ত্বাবধায়কের কার্যে নিযুক্ত হলেন ভোলানাথ।

শাহবাগ প্রকাণ্ড বাগান। এক অংশে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হলো। শ্রীশ্রীমায়ের মানসোপযোগী স্থান হলো এই শাহবাগের বাগানবাড়ি।

এই শাহবাগেই অবস্থান কালে, শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে যে দিব্য আকর্ষণী শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল, তারই অপ্রতিহত প্রভাবে কয়েকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরও হয়েছিল সমাগম।

প্রাণগোপালবাবু (ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়), বাউলবাবু (উকিল, স্কুলের শিক্ষক, শ্রীবাউলচন্দ্র বসাক), ননীবাবু (ঢাকা কলেজের প্রফেসর), নিশিবাবু (বিক্রমপুর, সামসিদ্দির জমিদার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মিত্র), প্রমথবাবু (ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার বসু) প্রভৃতি কয়েকজন প্রায়ই আসতেন। শ্রীশ্রীমা মাথায় ঘোমটা দিয়েই এঁদের কারো কারো সাথে দু'চারটি কথা যদি বা বলতেন, কিন্তু কাকেও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিতেন না।

বিশ্বজননীর দরবারে অর্থী, প্রার্থী, আর্ত, পীড়িত সকল রকমের ভক্তই আসতেন। যার যতটুকু প্রাপ্য ততটুকুই নিয়ে যেতেন। এইভাবে ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র ক'রে ঢাকায় শাহবাগেই প্রথম গড়ে উঠলো মাতৃমণ্ডলী। তাই তো ভক্তবৃন্দ সকলে আবেগের সঙ্গে বলতো, 'শাহবাগের মা'।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা হিরণবালা ঘোষ মা'কে খুবই ভালবাসতেন। তিনি বলতেন, "ঐ যে শাহবাগের সেই বউটি। প্রায় প্রতিদিন বাগানে সেই বউটিকে দেখতে যেতাম। বৈকাল ৩টা হ'তে ৪টার মধ্যে কতক্ষণে সেই সময়টা আসবে তাই আমি অস্থির হতাম। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলতেন, 'বাড়িতে থেকে কি ধর্ম হয় না? রোজই সেখানে কি?' ধর্ম মনে করে যেতাম তা মনে হয় না। কিন্তু

একদিন সেই বউটিকে না দেখলে প্রাণ অস্থির হতো। বাগানে যাবার জন্য ব্যাকুল হতাম। কেবলই মনে হতো, 'ঐ যে শাহবাগের সেই বউটি।' আমার ভালবাসাও যেন ক্রমশঃ সেই বউটির দিকেই যেতে লাগলো।"

* * *

—'তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?'

হাসি হাসি মুখে শ্রীশ্রীমা বলছেন আদরিণী দেবীকে। অবসর-প্রাপ্ত সিভিল সার্জন শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা 'খুকুনী' আদরিণী দেবী এসেছেন, 'শাহবাগের মা'কে দর্শন করতে। (আদরিণী দেবীর ডাকনাম 'খুকুনী')

শ্রীশ্রীমায়ের সাথে তাঁর এই প্রথম সাক্ষাৎকার। কিন্তু মনে হয় যেন তাঁদের পরিচয় একদিনের নয়, জন্মজন্মান্তরের।

শ্রীশ্রীমায়ের মুখে চোখে ফুটে উঠেছে শিশুর সারল্য। খুকুনী-দিদিকে পেয়ে 'মা' খুব খুশি। খুশি মনে বললেন—'ভগা তোমাকে উপস্থিত করে দিয়েছেন। এখন এই শরীর দিয়ে সব কাজ যেন ঠিকমত হয় না, তাই সাহায্য করবার জন্য ভগা তোমাকে নিয়ে এসেছেন।'

এই খুকুনীদিদি—আদরিণী দেবীই হলেন, আজন্ম ব্রহ্মচারিণী, চিরসন্ন্যাসিনী, কায়ব্যূহরূপিণী গুরুপ্রিয়া দেবী। প্রথম দর্শনেই ইনি শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে দেহ, মন, প্রাণ বিনাসর্তে এমন করে সমর্পণ করেছিলেন যে পৃথক অস্তিত্বের বোধটুকুও আর ছিল না।

শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক জীবনের সর্ববিধ ছোট বড় ঘটনার অন্তরালে ছায়ার মত আত্মগোপন করে ছিলেন সর্ব প্রয়োজনে খুকুনীদিদি রূপে। মায়ের সঙ্গিনীশিষ্যা, জীবনাদর্শের ভাষ্যকার, জীবনীকার, ভক্তিমতী সেবিকারূপে।

শৈশবে পুতুল খেলার মত নামমাত্র যে বিবাহের অনুষ্ঠান হয়েছিল, গুরুপ্রিয়া দেবীর জীবনে তার কিছুমাত্র তাৎপর্য ছিল না। সাধারণ দাম্পত্যজীবনের কোন অর্থই ছিল না তাঁর কাছে।

সাংসারিক বন্ধন বলতেও ছিল না কোন কিছু। এমন সময় মা' এলেন অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে, এই নিরাভরণার জীবনে। কূলে কূলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো, ধূসর জীবনের দিগন্ত-বিস্তৃত বেলাভূমি।

পিতা শশাঙ্কমোহনই হলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরি। শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম পার্ষদ। মরমী ভক্ত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মায়ের সেবায় ছিলেন ব্যাপৃত।

শ্রীশ্রীমায়ের সাথে প্রথম আলাপের পর গুরুপ্রিয়া দেবী বলছেন, 'নেশা লাগিয়াছে। পরদিন আবার গেলাম। দেখিলাম। কথা শুনিলাম। চলিয়া আসিলাম। কিন্তু বাসায় আর প্রাণ টিকে না। রোজই যখনই হয় একবার করিয়া 'মা'র কাছে যাই। সেই সময়-টুকুর প্রতীক্ষায় সারা দিন রাত বসিয়া থাকি। এক একদিন মা'কে দেখিবার জন্য মন হঠাৎ এত চঞ্চল হইয়া উঠিত যে সেদিনের মধ্যে দুইবারও গিয়া উপস্থিত হইতাম। ক্রমে পরিচয় গাঢ় হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে গিয়া মা'কে সাহায্য করি। পরিবেশনে সাহায্য করি। আমাকে পাইয়া মা'র খুবই আনন্দ।'

'নিজের অবস্থার কথাও আমার কাছে অনেক বলিতেন—আমার মত প্রায় সর্বদার সঙ্গী ও কথা শুনিবার মত লোক এখনও জোটে নাই। তাই যেন মহা আনন্দে প্রাণ খুলিয়া কত কথাই বলিতেন। আমিও মুগ্ধ হইতাম। প্রত্যহ কোন প্রকারে বাসায় গিয়া কিছুক্ষণ কাটাইবার পর চলিয়া আসিতাম।'

* * *

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি।

১৩৩২ সাল। বেলা দ্বিপ্রহর।

কীর্তন শুরু হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের দরবারে।

প্রথম প্রকাশ্য কীর্তন।

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।'

শ্রীশ্রীমায়ের ভাবান্তর হতে লাগলো। ভাবে ঢুলু ঢুলু। মুখশ্রী দৈবীভাবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো। চাহনি হলো মধুর হতে মধুরতর। গদগদ ভাব। সারা দেহ ভূমানন্দে ঢল ঢল। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব।

হঠাৎ মার সমস্ত শরীর তুলতে লাগলো। মাথার কাপড় পড়ে গেল। চোখ বুজে গেছে। কিন্তু শরীর যেন কীর্তনের তালে নামের সঙ্গে সঙ্গে তুলছে। এইভাবে তুলতে তুলতেই উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু শরীর যেন ছেড়ে দিয়েছেন। যেন কোন অদৃশ্য শক্তির সাহায্যে শরীরে নানারূপ ক্রিয়া হতে লাগলো। অবস্থা দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, এর মধ্যে নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি নাই। এমন ছেড়ে দিয়েছেন যে গায়ের কাপড়ও পড়ে যাচ্ছে। মা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে যেন একবার পড়ি পড়ি করেও বাতাসে ভর করেই উঠছেন। সমস্ত ঘরটা এইভাবে ঘুরতে লাগলেন। যেন কি ভয়ানক নেশায় মাতাল। যিনি কিছুক্ষণ পূর্বেই কত কাজ করছিলেন, তিনি যেন এখন কোথায় চলে গেছেন। ঊর্ধ্ব ও পলকহীন চক্ষু, মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সমস্ত শরীরে রক্তাভা। দেখতে না দেখতে দাঁড়ানো অবস্থা হতেই একেবারে মাটিতে পড়ে গেলেন। পড়েই যেমন ঘূর্ণিবায়ুতে কাগজ কি পাতা উড়িয়ে নেয়, তেমনিভাবে দ্রুত ঘুরতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে স্থির হয়ে বসলেন। নেত্র মুদ্রিত করে যোগাসনে উপবিষ্ট হলেন। স্থির। ধীর। অচল। অটল।

মা বসে, প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে উচ্চৈঃস্বরে পরিষ্কারভাবে নাম করতে লাগলেন ঃ

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।'

শুধু এইটুকুই গাইতে লাগলেন। কি সে সুর! কি মধুর ধ্বনি! শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

এইভাবে সন্ধ্যা হয়ে এল। খুব জোরে কীর্তন আরম্ভ হলো।

মা ঘোমটা দিয়ে মেয়েদের নিয়ে কীর্তনের আসরের একধারে মাটিতে বসেছেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই ভাব। শরীরে যেন নূতন নূতন ক্রিয়া হতে লাগলো। এবার চোখের সে শান্তদৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য পরিবর্তিত হয়ে ভীষণ ভ্রূকুটিতে পরিণত হলো। পা এবং দু'হাত এমনভাবে চলছে যেন যুদ্ধ ও তাণ্ডবনৃত্য হচ্ছে। দেহলতিকায় আর সে রক্তাভা নাই। যেন কালো আভা পড়েছে। কিছুক্ষণ পরে সে আভাও হলো পরিবর্তিত। অন্যরকম হতে লাগলো। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ভিন্ন এক রূপ ধারণ করলো। মনে হয় যেন সমস্ত শরীর দিয়েই করছেন আরতি। আরতির সঙ্গে সঙ্গে যেন শরীর আহুতি দিচ্ছেন। কতরকমই না হতে লাগলো।

আস্তে আস্তে বসে পড়লেন। বসে আছেন। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন যোগাসনে বসে অসীমের ধ্যানে নিমগ্ন; আর সেই যোগমন্ত্র শ্রীমুখ হতে উচ্চারিত হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। আওয়াজ বের হচ্ছে না। কয়েকবার চেষ্টার পরই অপূর্ব মন্ত্র ও স্তোত্র শ্রীমুখ হতে উচ্চারিত হতে লাগলো। কি সুন্দর সেই ধ্বনি! কি ভাবপূর্ণ মধুর কণ্ঠস্বর! তিনি যেন বলছেন,……'হে মহাবীর্য, তুমি উত্থিত হও, সমস্ত আবরণ বিদীর্ণ কর, ভাগবদ্‌বিভূতি আমাদের মধ্যে ফুটাইয়া তোল।'

কিন্তু সে ভাষা কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না। কয়েকটা বীজমন্ত্রের মত শোনাচ্ছে। অনর্গল স্তোত্র উচ্চারিত হচ্ছে। আবার ধীরে ধীরে স্তোত্র বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এইভাবে অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত হলো। ধীরে ধীরে স্তোত্র বন্ধ হয়ে এল। ক্রমে ক্রমে মা নীরব হয়ে স্থিরভাবে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর শুয়ে পড়লেন।

রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হতে লাগলো। উপবাসী ভক্ত-

জনেরা প্রসাদ গ্রহণ করলেন। তাই ভোলানাথ শ্রীশ্রীমাকে ওঠাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মা উঠতে পারছেন না। অস্পষ্টভাবে বলছেন, 'উঠতে পারি না। শরীর অবশ।' কাপড় ঠিক করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু হাত ঠিক নেই। পারছেন না। এই জন্য নিজেই আবার শিশুর মত হাসছেন। নেত্র নিমীলিত। ভাল করে শুনতে পারছেন না। কিন্তু মুখে হাসিটুকু লেগেই আছে। মহাভাবে শ্রীমুখ সমুজ্জ্বল, তার মধ্যে এই হাসিটুকু খুবই ছিল মিষ্টি।

শ্রীশ্রীমায়ের সেদিনকার লীলা ও লোকাতীত বিলাসবৈভবপূর্ণ মূর্তি দেখে উপস্থিত অনেকেই দিব্যভাবে হয়েছিলেন আবিষ্ট।

শ্রীশ্রীমায়ের নাম পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে পড়লো ছড়িয়ে। মূর্তিমতী আনন্দরূপিণীরূপে প্রকাশিতা হলেন 'মা'। শ্রীশ্রীমা—'শাহবাগের মা' হলেন জগতের জননী।

বারো

'ক্ষুধা। ক্ষুধা চাই।'

'ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। তাহলে তিনি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। তিনি তো হাত বাড়িয়েই আছেন। একবার হাতটি ধরলেই তিনি কৃতার্থ।' শ্রীশ্রীমা বলেছেন জ্যোতিষবাবুকে (শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়, আই. এস. ও. (I.S.O.) Personal Assistant to the Director of Bengal)।

পিতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় ছিলেন ঋষিকল্প পুরুষ। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২রা শ্রাবণ শুক্রবার, শুক্লা দশমীতে, চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বংশে জন্ম হয় জ্যোতিষচন্দ্রের।

ইনিই হলেন 'ভাইজী'। শ্রীশ্রীমায়ের লৌকিক লীলার অন্যতম পার্ষদ। জীবনাদর্শের ভাষ্যকার, জীবনীকার।

শাহবাগে প্রথম দর্শনেই এঁর মনে শ্রীশ্রীমায়ের ভাবঘন মূর্তিখানি এমন দৃঢ়ভাবে বসে গেল যে, মা তাঁর মানুষী অবয়বে অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী নিত্যধ্যেয়া চতুর্ভুজা ইষ্টমূর্তির স্থান অনায়াসে অধিকার করে বসলেন।

দিনে, দিনে, বৎসরে, বৎসরে, মায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লীলারহস্যের পাকে পাকে জড়িয়ে গিয়ে শ্রদ্ধার সাহচর্যে ভাইজী হয়ে উঠলেন মাতৃময়। শ্রীশ্রীমায়ের পদতলে তিনি সর্বস্ব সমর্পণ করে 'মৌনানন্দ পর্বত' নামে সন্ন্যাস জীবন বরণ করলেন।

—'আমার পারমার্থিক উন্নতির কোন আশা আছে কি?' ভাইজী প্রশ্ন করলেন।

—'ক্ষিদে তো এখনও পায়নি।' বিষয়-বাসনায় উদ্বেলিত জীবের সে ক্ষুধা হওয়া বড়ই কঠিন।' শ্রীশ্রীমা বললেন।

'মা ক্ষুধারূপিণী তো তুমি, তুমিই ক্ষুধা দাও।' মনে মনে বললেন ভাইজী।

এইভাবে ভাইজীর সাথে কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীমা হলেন ভাবস্থ। ভাব-সমাধি।

শ্রীশ্রীমায়ের সেই শান্ত যোগাবস্থা অথচ কুলবধূর ভাব; দুটি ভাব যুগপৎ অবলোকন করে মুগ্ধ হলেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়। আপনা হতেই তাঁর মাথা হলো অবনত শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণকমলে।

*   *   *

জ্যোতিষচন্দ্রের সন্তানভাব। বাৎসল্যরস। মায়ের উপর শিশুর মত একান্ত নির্ভরতা। মায়ের নামে আত্মহারা। তন্ময়তা। মায়ের কথায় অখণ্ড বিশ্বাস। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব।

একদিকে ছিল কর্মজীবনের বন্ধন। অপরদিকে স্ত্রী, পুত্র, কন্যার সুস্পষ্ট প্রতিকূলতা।

কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। মায়ের শ্রীচরণে পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ।

শ্রীশ্রীমা বলেন ভোলানাথকে,—'দেখ, জ্যোতিষ আমার ভগবান।'

শাহবাগে ভক্তজনদের খুবই ভিড়। শ্রীশ্রীমাকে একান্তে পাওয়া খুবই কঠিন। জ্যোতিষচন্দ্র মায়ের দর্শন না পেয়ে, নিজগৃহে বিমর্ষ মনে আছেন বসে।

হঠাৎ এল বিশ্বজননীর আহ্বান। 'আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য মাতাজী গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।' বললেন শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন চৌধুরী।

মনের সাময়িক বিমর্ষতার হলো অবসান। হৃষ্টমনে চলে এলেন শাহবাগে।

শ্রীশ্রীমা বললেন, 'তোর অস্থিরতা আমি এই কয়দিন লক্ষ্য করে আসছি। অস্থিরতা না এলে স্থিরতা আসে না।

ঘৃতে পারো, চন্দন কাঠে পারো, এমন কি খড়কুটো দিয়ে হলেও যে কোনরূপে আগুন জ্বালানো দরকার। আগুন একবার জ্বলে উঠলে আর ভাবনা নেই।

সব ক্ষয় করে দিতেই হবে।

দেখিস না একটু আগুনের কণা, কত যত্নের তৈয়ারি বড় বড় ঘরবাড়ি নিমেষে নষ্ট করে দেয়।'

* * *

গভীর রজনী। ভাইজীর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হলো। সেই মুহূর্তেই শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের জন্য হৃদয়ভেদী অস্থিরতা উঠলো জেগে। গৃহের খোলা বারান্দায় করতে লাগলেন পায়চারি। জ্যোৎস্নার প্লাবনে তখন সমস্ত জগৎ ঝিক্‌মিক্ করছে।

ভাইজী হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। কল্পনা নয়। স্বপ্নও নয়। ক্ষুধারূপিণী মা। রহস্যময়ী শ্রীশ্রীমা ছায়ামূর্তির মত তাঁরই অদূরে দণ্ডায়মান। বিস্মিত নেত্রে অবলোকন করলেন জগন্মাতাকে। বিশ্ব-জননীকে। শাহবাগের মাকে।

অনির্বচনীয় এক আনন্দসাগরে অবগাহন করে ধন্য হলেন তিনি।

পরের দিন এই ঘটনার কথা শুনে মা বললেন।—'আমি দেখতে গিয়েছিলাম, তুই কি করছিস।' বলেই, মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

'ভাইজী' শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভের পর কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার কথা বলছেন।

'মাঘ মাস, ভয়ঙ্কর শীত। মায়ের সহিত প্রত্যূষে খালি পায়ে রমনার ভিজা মাঠে বেড়াইতেছি। দূর হইতে দেখি কি একদল মেয়ে আসিতেছেন। আমার মনে হইল, ইঁহারা আসিলেই তো মাকে আশ্রমে নিয়া যাইবেন। এরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি কি সমস্ত মাঠ ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং দর্শনার্থিনীদের আর দেখা গেল না। ২।৩ ঘণ্টা পরে আশ্রমে আমরা যখন ফিরিলাম, শোনা গেল মাঠে তাঁহারা আমাদের খুঁজিতে খুঁজিতে হয়রান হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। মাঠটি খুবই বড়। এই কথা মাকে জানাইলে তিনি বলিলেন, তোর তীব্র ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে।'

"একবার মা'র খুব সর্দি ও কাশি হইয়াছে। আমি দেখিয়া কাতরভাবে বলিলাম, 'মা শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠুন।' শ্রীশ্রীমা মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'কাল হতে ভাল হব।' তাই হইয়াছিল।"

"একদিন সকালে গিয়া দেখি মা'র জ্বর। আমি সে রাত্রিতে ঘরে বসিয়া খুব একান্ত মনে মার নিকট প্রার্থনা জানাইলাম যে মা'র অসুখটি আমার ভিতর আসুক। দেখি কি শেষরাত্রে আমার জ্বর ও মাথাধরা হইল। সকালে মা'র কাছে যাইতে না যাইতেই মা বলিলেন, 'আমি তো ভাল হয়ে গেছি, তোর তো জ্বর হয়েছে। আজ গিয়ে স্নান করে বেশ খাওয়া দাওয়া কর্।' আমি তাহাই করিলাম, বিকাল হইতে শরীর ভাল হইয়া গেল।

মা বলেন, 'শুদ্ধ, অনন্য ভাবের বলে সবই সম্ভব হয়'।"

ভক্ত ও ভগবানের এই লীলাখেলা চললো, দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বৎসরের পর বৎসর। এ খেলা তো নূতন নয়। যুগে যুগে চলেছে এ লীলা-রহস্যের খেলা।

তের

শ্রীশ্রীমায়ের লীলা বিস্তারের অলৌকিক কাহিনীর অন্যতম হলো সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের ঘটনা। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে মায়ের যোগাযোগ প্রাণের। বাজিতপুরে থাকতেই মানসচক্ষে শ্রীশ্রীমা দেখেছিলেন ঢাকায় এই মন্দিরকে আর মন্দিরের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে।

এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সন্ধান মিললো অতি অপ্রত্যাশিতভাবে। বন-জঙ্গলের মধ্যে পূর্বদৃষ্ট মন্দিরটি যেমনটি দেখেছিলেন শ্রীশ্রীমা, ঠিক তেমনই ভাবেই যেন মায়ের আসার অপেক্ষায় মন্দিরটিও পথ চেয়ে ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণের পর ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় একখানি ঘরও তৈরি হলো—সিদ্ধেশ্বরীতে।

সিদ্ধেশ্বরীর পূর্ব ইতিহাস শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হতে নিঃসৃত হয়। শ্রীশ্রীমা বলছেন, 'একদিন শ্রাবণ মাসে, যে বৎসর ভোলানাথের শাহবাগে চাকুরি হয় সেই বৎসরই,—বাউল আমাদের সঙ্গে শাহবাগে ফিরবার পথে বললো, 'একদিন তোমাদের সিদ্ধেশ্বরী নিয়ে যাবো।' বাউলের সঙ্গে রমনার বাড়িতেই কিছুদিন পূর্বে দেখাশুনা হয়েছিল। আরও পূর্বের কথা এই যে বাজিতপুরে একদিন আমার চোখের সামনে একটি গাছ ভেসে উঠেছিল ও ভিতরে জেগেছিল 'সিদ্ধেশ্বরী গাছ'। তারপর শাহবাগে এসে একদিন ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সিদ্ধেশ্বরী গাছ কোথায়?' ভোলানাথ বলতে পারলেন না। পরে বাউলের মুখে এই কথা

শুনলাম। ভোলানাথকে ইশারায় আমি যে পূর্বে সিদ্ধেশ্বরীর কথা বলেছিলাম তা প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিলাম। এর পর একদিন বাউল এসে রাত্রিতে আমাদের সিদ্ধেশ্বরী নিয়ে গেল। যে অশ্বত্থ গাছটি পড়ে ছিল তা দেখেই আমি স্পর্শ করলাম। পাতায় হাত দিলাম। বুঝলাম এই গাছই আমি দেখেছিলাম। বাউলের মুখে শুনলাম এখানে বহু পূর্বে মন্দিরাদি ছিল না। পরে 'সম্বরবন' নামে এক সন্ন্যাসী এই মন্দির স্থাপন করেন। এখানে এক সঙ্গে তিনটি বৃক্ষ ছিল। তাই তিন্তিড়ী নাম হয়েছিল। অন্য দুইটি এখন নাই। এই অশ্বত্থ গাছটি মাত্র আছে। প্রবাদ এই যে, এই অশ্বত্থ বৃক্ষ হতে একটি জ্যোতি বের হয়ে মন্দিরস্থিতা কালীমূর্তিতে মিলে গিয়েছিল। আমরা লণ্ঠন নিয়ে মন্দির দেখে চলে এলাম। তখন সিদ্ধেশ্বরীতে এই সব বাড়িঘর ছিল না। এর পর আরও একদিন আমরা বাউলের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরী গেলাম। গিয়ে দেখি তালা বন্ধ। আমি তালা ধরে টান দিতে তালা খুলে গেল। বাউল বললো, 'মা'র ইচ্ছাতেই এইরূপ হইল।' পরে আমরা আর রাত্রিতে ফিরতে পারলাম না। কারণ মন্দির খোলা রেখে কি করে ফিরবো ? ভোর-বেলায় তালাটি আলগাভাবে লাগিয়ে আমরা ফিরে এলাম। সিদ্ধেশ্বরীর মোহন্তদের এই কথা বলা হয়েছিল। তারা তালা খোলা দেখে মনে করেছিল, বন্ধ করবার সময় হয়তো তালা ভাল লাগেনি। তালা যে আমি টান দিতেই খুলে গেল, পূর্বে খোলা ছিল না; একথা কাউকে বলতে আমি নিষেধ করেছিলাম। এর পর একদিন সিদ্ধেশ্বরীতে গিয়ে ভোগ দিয়ে খাওয়া-দাওয়া হলো। মুগ ডাল, নারিকেল ভাজা, আলু সিদ্ধ, ভাত রান্না হলো। তারপর আমি ভোলানাথকে বললাম, 'আমি এখানে থাকবো।' তখন স্থির হলো দিনে খুকুনির বাবা গিয়ে সিদ্ধেশ্বরী থাকবেন ও সন্ধ্যার পর ভোলানাথ যাবেন। আমি কালী-মন্দিরের পাশের ছোট কুঠরিতে থাকবো বললাম। তাই হলো। আমি ভোর বেলা স্নানাদি করে ঘরে ঢুকতাম। দিনরাত্রিতে আর বাইরে

আসতাম না। সারাদিন কিছু খাওয়া ছিল না। রাত্রিতে বাউল গান করতে করতে ফলাদি নিয়ে আসতো। অনেক রাত্রিতে তাই ভোগ দিয়ে খাওয়া হতো..... কখনও কখনও রাত্রিতে মোহন্তরা ফুল ও চন্দন রেখে যেতো। হয়তো ফুল কালীকে দিয়েছি। কিন্তু এসবই অস্বাভাবিকভাবে নিবেদন ও পূজা ইত্যাদি হয়ে যেতো। এইভাবেই ভোগ নিবেদন করা হতো। পরে আমি ভোলানাথকে বললাম, আমার ত আর এসব হয় না যেন। তোমার যে মন্ত্র আছে তা দিয়েই তুমি ভোগ নিবেদন করিও।

তিনি পরে তাই করতেন। এইভাবে সাতদিন কেটে গেল। ভোলানাথ কালীমন্দিরের এক ধারে থাকতেন। কখনও নিজের কাজ করতেন, কখনও শুয়ে থাকতেন। আমিও রাত্রিবেলা কালীমন্দিরেই থাকতাম। ভোরে স্নানাদি করে ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকতাম। বাউল মন্দিরের দরজায় থাকতো। এইভাবে সাতদিন কাটলো। আট দিনের দিন ভোরে ভয়ানক বৃষ্টি। আমি ভোলানাথকে ইশারায় (তখন মা'র তিন বৎসরের মৌন চলছে) ডেকে নিয়ে বের হয়ে গেলাম। কোথায় কোন্ রাস্তা কিছুই জানি না, একেবারে উত্তরদিকে চললাম। শেষে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে শরীরটা দাঁড়াল। তিনবার প্রদক্ষিণের মত হলো। পরে দক্ষিণ মুখ হয়ে কুণ্ডলী দিয়ে বসে পড়লাম। এবং স্তোত্রাদি উচ্চারিত হতে লাগলো। কারণ তখন এইভাবেই কথা বের হতো। বসেই মাটিতে হাতখানা চেপে রাখলাম। আশ্চর্যের বিষয়, এক একটা মাটির পর্দা সরে যাচ্ছে, আর হাতটা অবাধে ঢুকে যাচ্ছে। এইভাবে যখন বাহুমূল পর্যন্ত ঢুকে গেছে তখন ভোলানাথ আমাকে ধরে ফেললেন ও টেনে হাত তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প লাল রঙের গরম জল উঠতে লাগলো। (মা মাটিতে ঢুকে যাচ্ছিলেন দেখে ভোলানাথ ভয়ানক ভয় পেয়েছিলেন। এখন হাতে ঐ জিনিসটা দেখে কি জানি আবার কি হয় ভেবে মা'র হাত হতে নিয়ে ঐটি সিদ্ধেশ্বরীর পুকুরের

জলে ফেলে দিলেন। পরে ভোলানাথকে বললেন, 'তুমি হাত দাও।' ভোলানাথ হাত দিতে অমত করায়, মা বললেন, 'ভয় নেই, তোমার হাত দেওয়া দরকার, হাত দাও।' তখন তিনি হাত দিলেন। ভোলানাথ বললেন, 'স্থানটা যেন একেবারে ফাঁকা লাগলো আর গরম বোধ হলো।' ভোলানাথের হাত তুলবার সঙ্গে সঙ্গে লাল গরম জল উঠলো।) আমি ও ভোলানাথ দেখলাম,—জল উঠে গড়িয়ে যাচ্ছে। তখন মাটি দিয়ে ঐ স্থানটি বন্ধ করে আমরা চলে এলাম। আশ্চর্যের বিষয় বাউল রোজ জেগে থাকতো, কিন্তু সেই সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমরা ফিরে এলে বাউল জাগরিত হলো। জেগে উঠে খুব দুঃখ করল। বাউলের ভোগ দেবার ইচ্ছা হলো। সেই সব বন্দোবস্ত করতে সে চলে গেল। আমি ও ভোলানাথ আবার সেই স্থানটায় গিয়ে ভিতরে হাত দিলাম। পরে একবার শাহবাগ গিয়ে সন্ধ্যার পর সিদ্ধেশ্বরী ফিরে এলাম এবং রাত্রিতে আমিই ভোগ পাক করলাম। ভোগের পর আবার ফিরে এলাম শাহবাগে।'

* * *

ভাইজী, মা ও বাবা ভোলানাথ এসেছেন সিদ্ধেশ্বরীতে। শ্রীশ্রীমা, আনন্দবিলাসিনী বিশ্বজননী এসে বসলেন মন্দিরের নিকটস্থ কুণ্ডের মধ্যে। মা ভাবস্থ হলেন। দিব্যজ্যোতিতে মুখমণ্ডল হয়ে উঠলো উজ্জ্বল। দিব্য ভাবের ভাবোন্মাদনায় মা ধারণ করলেন আনন্দময়ীর মূর্তি। সে এক অপূর্ব অনির্বচনীয় মূর্তি। সুখ-প্রদায়িনী, নারায়ণী, জগন্মাতার সেই অভাবনীয় অনির্বচনীয় মূর্তি অবলোকন করে মুগ্ধ হলেন ভাইজী, চিরসন্ন্যাসী মৌনানন্দ পর্বত।

ভাইজীর কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হলো 'আনন্দময়ী মা'। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। আনন্দই যাঁর ভাব। আনন্দই যাঁর উপাদান। আনন্দেই যিনি অবস্থিতা। যিনি জগতের আনন্দলীলা করবার জন্য আনন্দঘন মূর্তি ধারণ করেছেন, তিনিই তো আনন্দময়ী। তাঁরই

নাম আনন্দ। আনন্দরূপেই তাঁকে আমরা খুঁজবো। উপাসনা করবো। আনন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আনন্দ। আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দই সৃষ্টির রহস্য। আনন্দই জন্মের মূল। আনন্দ আছে বলেই তো সব কিছু বর্তমান। আনন্দই জন্মের অন্ত। সৃষ্টির বিলয়।

তাই তো মা আমাদের আনন্দময়ী। ভাইজী তখনই পিতাজী ভোলানাথকে বললেন,—আজ হতে আমরা শুধু 'মা' বলে ডাকবো না। বলবো 'আনন্দময়ী মা'। 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী'।

মা স্থিরদৃষ্টিতে, ভাইজীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই সমাধিস্থ হলেন। পরে হাসতে হাসতে মা বলেছিলেন ভাইজীকে,—সিদ্ধেশ্বরী না গেলে, এই শরীরের নামকরণও বা কি করে হতো?

চোদ্দ

সকলে যাকে পূজা করে আনন্দ পায়, তিনিই যখন ভক্তদের শিক্ষার জন্য দেবতার পূজা করতে বসেন, সে পূজার মহিমা যে কত অপরূপ হয়ে ওঠে তা অনির্বচনীয়। শ্রীশ্রীমা করবেন কালীপূজা।

যথাসময়ে মূর্তি এল। পূজার সময় শ্রীশ্রীমা আসনস্থা হয়ে কিছু সময় মাটির উপর স্থিরভাবে বসে রইলেন। ভাবে বিভোর হয়ে পড়লেন। ঢুলু ঢুলু ভাব নিয়ে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করতে করতে ডান ও বাম হাতে নিজের মাথার উপরই ফুল চন্দনাদি দিতে লাগলেন। কখনো কখনো আবার কালীমূর্তির গায়েও ছড়িয়ে দিলেন কয়েকটা ফুল। চিরপরিচিত বিধি-নিয়মে নয়, শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছামত এইভাবে সম্পন্ন হলো পূজা। বলিরও ব্যবস্থা ছিল। ছাগটিকে উৎসর্গ করতে নিয়ে আসা হলো। শ্রীশ্রীমা ছাগটিকে কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলেন, পরে উৎসর্গ করলেন। ছাগটি কেমন নিস্তেজ হয়ে নিজেই বলির স্থানে এসে দাঁড়ালো। মা নিজে প্রতিমার সম্মুখে টান হয়ে শুয়ে পড়লেন এবং পাঁঠার ডাকের মত

তিনটি ডাক তাঁর মুখ হতে বের হলো। পরে বলির সময় পাঁঠাটি আর কোন রকম চীৎকার ও ছটফট করলো না। বলির পর পাঁঠাটির দেহ হতে এক ফোঁটা রক্তও নির্গত হল না। অতি কষ্টে এক ফোঁটা রক্ত হোমের জন্য সংগ্রহ করা হলো। এইভাবে পূজার সকল অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে হল সম্পন্ন।

তখন রাত্রি শেষ প্রহর। মার ভাবসমাধি হল। ভাবাবস্থায় আনন্দমগনা, নগেন্দ্রনন্দিনী, ত্রিলোকপালিকা, হর-মনোমোহিনী, ভৈরবী ভবানী শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক ঐশ্বর্যাদি দর্শন করে ভক্তজনেরা হয়েছিলেন অভিভূত।

পরের বৎসর। ১৩৩৩ সন। ভক্তবৃন্দেরা আবার মাকে ধরেছে কালীপূজা করবার জন্য। শ্রীশ্রীমা কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। মা ভোলানাথকে বলছেন, 'তুমিও আর এসব কাজে অনুরোধ করো না। আমি কোন কাজই করে উঠতে পারছি না।' অবশেষে ঠিক কালীপূজার দিন ভোলানাথের নির্দেশে হঠাৎ কালীপূজার আয়োজন করা হলো। শেষ পর্যন্ত মূর্তিও এল। কালীপূজার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত।

সন্ধ্যা হয়ে এল। তখনও শ্রীশ্রীমা স্থিরভাবে আছেন বসে। ভোলানাথ মাকে ধরে স্নান করিয়ে নিয়ে এলেন। পরিয়ে দিলেন নববস্ত্র। শ্রীশ্রীমা সৌম্যমূর্তি ধারণ করে তখনও পাথরের মত নিশ্চল হয়ে রইলেন।

কীর্তন হলো শুরু। ঘরে লোকে লোকারণ্য। কীর্তনের ঘরেও একই অবস্থা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি অধিক হতে লাগলো। ভোলানাথ পূজার জন্য অনুরোধ করলেন শ্রীশ্রীমাকে।

লোকমাতা 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী' পূজায় বসলেন। এ যেন জীবন্মুক্তা সাধিকা বসেছেন সাধনায়। বাম হাতে পূজা করতে লাগলেন। কিন্তু অল্প সময় মাত্র, হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং ভোলানাথকে বললেন, 'আমি বসি, তুমি পূজা কর।'

পর মুহূর্তেই অট্টহাসি হেসে, চোখের পলকে ভক্তবৃন্দের মধ্য দিয়ে ঘুরে কালীমূর্তির সংলগ্ন হয়ে বসে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের গাত্রবস্ত্রও পড়ে গেল। লোল-জিহ্বা নির্গত হলো। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য।

ঘোলাটে লোচনা, অসুরনাশিনী, প্রলয়কারিণী কালী-মহাকালী, ভদ্রকালী কপালিনীর মূর্তি ধারণ করলেন শ্রীশ্রীমা।

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাবা ভোলানাথ, 'মা-মা' বলে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে উঠলেন। তারপর দু'হাত ভরে অঞ্জলি দিতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে উকিল শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক মহাশয় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন জ্যোতির্ময়ী মায়ের রুদ্রাণী মূর্তি নয়নগোচর করে। শ্রীযুক্ত বসাক মহাশয় আইন-ব্যবসায়ী ও দৃঢ়প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

পরে তিনি বলেছিলেন।—'মা'র মুখমণ্ডলে এক উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করে আমি অভিভূত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

সবকিছুই ক্ষণিকের জন্য।

আবার শ্রীশ্রীমা,—আনন্দবিলাসিনী, আনন্দময়ীর মূর্তি ধারণ করলেন। যেন রাজরাজেশ্বরী পরমৈশ্বর্যদায়িনী কল্পলতারূপিণী শ্রীশ্রীজগদীশ্বরী।

ফুলে সমস্ত শরীর গেছে ঢেকে। ভোলানাথ ফুল বিল্বপত্র দিয়ে মাকে পূজা করছেন, বিশ্বজননী গ্রহণ করলেন ভক্তজনদের পূজা।

পূজা সমাপন হতে হতে রাত্রিও হলো সমাপন। ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর শ্রীচরণযুগলে অঞ্জলি দিয়ে হলেন ধন্য।

প্রাতঃকালে ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর অবস্থানে শাহবাগ এখন আনন্দধামে পরিণত হয়েছে। দিবারাত্র যেন আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে এই শাহবাগের বাগানবাড়িতে।

প্রায় প্রতিদিনই কীর্তন হচ্ছে। কখনও কীর্তনের দল এসে পালাগান করছেন। আবার কোনদিন শ্রীশ্রীমা ভক্তগৃহে গিয়ে কীর্তন করছেন। মা ভক্তদের সাথে নিত্য নূতন লীলা করে চলেছেন।

অধিকাংশ সময়ই মা ভাবে ডুবু ডুবু। অন্যমনস্ক ভাব। মৌনী থাকবার ইচ্ছা। ভক্তরা নাছোড়বান্দা।

রাজশাহীর প্রফেসর শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ভট্টাচার্য সস্ত্রীক এসেছেন। কাশী থেকে এসেছেন শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আর আছেন অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীনিরঞ্জন রায়, শ্রীকালীপ্রসন্ন কুশারী, ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত, অতুল ব্রহ্মচারী, যোগেশ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তজনেরা।

প্রশ্ন উঠেছে অবতার ও সাধকে প্রভেদ কি ?

শ্রীশ্রীমা কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকলেন, তারপর বললেন, 'যিনি সাধক, তিনি কোন একটা নিয়মে, কি কতকগুলি নিয়মে নিজেকে আজীবন বেঁধে রাখেন। কিন্তু যিনি অবতার, তিনি-কোন নিয়মেরই অধীন হন না। যদিও ঠিকভাবে সবই তাঁর ভিতর দিয়েই হয়ে যায়। কিন্তু তিনি কোনটাতেই বদ্ধ থাকেন না। লক্ষ্য করলে ধরা যায়। অবশ্য সাধারণের ধরা মুস্কিল।'

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কুশারী বললেন, দেখুন আপনি কথা বলতে বলতে কোথায় চলে যান বলতে পারেন ? পরিষ্কার বোঝা যায় আপনি এখানে ছিলেন না। কি রকম ভাব হয় বলুন তো ?

মা মৃদু হেসে বললেন, 'যে চিনি না খেয়েছে তাকে ঠিক বোঝান যায় না, চিনি কেমন মিষ্টি।'

মা যতই চেষ্টা করেন চুপচাপ থাকতে, ভক্তজনেরা ততই করে তোলেন ব্যতিব্যস্ত। মাও হেসে বলেন, 'মেশিন আর কি ! তোমরা যতটুকু চালাইয়া নেও, চলে, আবার বন্ধ হয়ে যায়।'

*   *   *

শাহবাগের নিকটেই শিখদের আখড়ায় এসেছেন শ্রীশ্রীমা। মহাভাবের প্রেরণায় হ'য়ে রইলেন বিভোর। আবার একদিন এক মুসলমান বেগমের আব্দারে মুসলমানের কবরে নামাজ পড়লেন।

মা বলেন, 'হিন্দু মুসলমান বা অন্যান্য জাতি সবাই তো এক। এক জনাকেই তো সবাই চায়, ডাকে ; নামাজ যা কীর্তনও তা।' আবার বলছেন, 'আমি দেখছি জগৎময় একটি বাগান, তোরা এই বাগানের ফুলের মতো চারিদিকে ফুটে রয়েছিস। আমি এই একই বাগানের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি মাত্র।'

বহু ভক্তসমাগম হয়েছে শাহবাগে। সংসারী ভক্তজনেরা সংসারিক নানা প্রশ্ন করছেন। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী শুয়ে শুয়ে কথা বলছেন, হাসছেন ; সংসারী ভক্তদের সাথে।

মা বলছেন, 'বদ্ধজীব সংসারে মত্ত। তারা ভগবানকে চায় না, পেলেও সহ্য করতে পারে না। তাদের রুচিতে বিষয়-সুখই প্রিয়তর। বিষয় ছাড়তে হলে তারা অসন্তুষ্ট।'

একটি গল্পের মাধ্যমে মা বিষয়টি বোঝাচ্ছেন—'শ্রীভগবানের আদেশে একদিন নারদ মর্ত্যধামে অবতরণ করে এক শূকরীকে বৈকুণ্ঠবাসের নিমন্ত্রণ করলেন। শূকরী তার স্বামীকে এই সমাচার জানিয়ে বললো, "চলো না দিন কতক চেঞ্জে ঘুরে আসি, বৈকুণ্ঠে খাদ্যদ্রব্য কি রকম পাওয়া যাবে সেটা তো নিশ্চিত করে জানা দরকার প্রথমে।"

একথা শুনে নারদ বললেন, "বৈকুণ্ঠে কারও কোনও চিন্তা নেই ; তোমরা স্বয়ং নারায়ণের অতিথি। তোমাদের অন্নচিন্তা থাকবে এ একটা কথা! চলো আমার সঙ্গে। তোমরা মহানন্দে থাকবে বৈকুণ্ঠে। সেখানে সবকিছু সুন্দর। সবকিছু পবিত্র।" তখন বরাহপ্রবর জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের প্রিয় খাদ্য বিষ্ঠা নিত্য পাবো তো?"

নারদকে স্বীকার করতে হলো যে উক্ত বস্তু বৈকুণ্ঠে দুর্লভ।

তৎক্ষণাৎ বরাহদম্পতি সমস্বরে নারদের নিমন্ত্রণ করলো প্রত্যাখ্যান।'

মা গল্পটি বলেই হাসতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমায়ের হাস্যের উচ্ছলতায় রস ও রহস্যে হয়ে উঠলো ভরপূর।

* * *

মায়ের কাছে সব সময় ভীড় আর গোলমাল। নির্জনে মাকে পাবার উপায় নেই। একথা শুনে মা ভক্তবৃন্দকে একটি গল্প বলছেন।

'এক ভদ্রলোকের হাট থেকে কিছু জিনিসপত্র কেনা দরকার। হাটের কাছাকাছি গিয়ে তিনি শুনতে পেলেন ভীষণ গোলমাল। ভাবলেন এত ভীড়ের ভিতর যাওয়ার দরকার নেই। গোলমাল চুকে যাক তারপর যাবো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর, কলরব হলো শান্ত। ভদ্রলোক তখন হাটে ঢুকলেন এবং দেখলেন, গোলও নেই, মালও সব উঠে গেছে।'

গল্প শেষ করেই মা আবার সেই প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগলেন।

মা আবার বলছেন, 'চাকরির পেন্সন মৃত্যুর পর থাকে না। কিন্তু সেই পেন্সনের আর লয়, ক্ষয় নাই।'

'যারা অর্থ সঞ্চয় করে তারা ঘরের কোণে এক জায়গায় একটি চোরকুঠুরি রাখে। তাতে যখন যা পারে জমায়। তার রক্ষণাবেক্ষণের সর্বদা খেয়াল রাখে। তেমনি ভগবানের জন্য যে ভাবে যার ভাল লাগে হৃদয়ের এক নিভৃত কোণায় একটু জায়গা করো। যখনই একটু অবসর পাও তখনই সেখানে তাঁর নাম বা ভাবের সঞ্চয় করতে থাকো।'

'সময় হলে শুকনো পাতাগুলি আপনা হতে ঝরে গিয়ে নূতন পাতা দেবে দেখা।'

* * *

চিত্ত সমাধান : কতকটা শুষ্ক কাষ্ঠে আগুন জ্বালানোর মত। ভিজা কাঠ হতে জল শুকিয়ে গেলে যেমন ধক্ ধক্ করে আগুন জ্বলতে থাকে, সেই রকম উপাসনার ঐকান্তিকতায় বাসনা কামনার রস যখন চিত্ত হতে কমে যায়, তখন চিত্ত হালকা হয়ে পড়ে। সেই অবস্থাকে বলে ভাবশুদ্ধি। এই অবস্থায়ই ভাবোন্মদনা জন্মে।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সাধনার চরম অবস্থা সম্বন্ধে বলছেন, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়কে।

—এর পরের ভূমি ; **ভাব সমাধান**। যেমন পোড়ানো কাঠ-কয়লা। একই সত্তার এক অখণ্ডভাবের তন্ময়তায় শরীর অবশ হয়ে পড়ে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাধক জড়ভাবে কাটিয়ে দেয় অথচ অন্তরের গুহায় ভাবপ্রবাহ চলতে থাকে অক্ষুণ্ণ। যেমন একটি আধারে আয়তনের অধিক জল ঢালতে গেলে তা পূর্ণ হয়ে অতিরিক্ত জল উপচে পড়ে যায়, তেমনি অখণ্ডভাবের দ্যোতনায় চিত্ত ছাপিয়ে তার ভাবাবেগ বিশ্বময় বিরাট স্বরূপ বিগলিত হ'য়ে পড়ে।

তৃতীয় ভূমির নাম, ব্যক্ত **সমাধান**। যেমন জ্বলন্ত কয়লা। ভিতরে বাইরে একেবারে অগ্নিদীপ্তি। জীব এই অবস্থায় এক সত্তাতে স্থিরভাবে করে বিরাজ।

আর **পূর্ণ সমাধান** অবস্থায় সাধকের সগুণ নির্গুণের দ্বন্দ্ব যায় চলে। যেমন জ্বলন্ত কয়লার ভস্মের আগুন। সাধক এই অবস্থায় এক অনির্বচনীয় ভাবে হয়ে যায় স্থির। অন্তরে বাইরে থাকে না কোন ভেদাভেদ। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' অবস্থা। সকল ভাবের স্পন্দন এই অবস্থায় হয়ে পড়ে অস্তমিত।

আবার মা বলতে লাগলেন সাধকের লক্ষণাদি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়কে।

যখন সাধক চিত্তশুদ্ধির দ্বারা কতকটা উন্নত হয় তখন সে সাময়িকভাবে কখনো বালকবৎ, পিশাচ বা জড়বৎ হয়ে পড়ে। কখনো সে সাধারণ লৌকিক ভাবের উচ্ছ্বাসের ভিতর থাকে। কিন্তু

এই সকল সাময়িক পরিবর্তনের ভিতরও, তার চিত্তের একমুখী গতি লক্ষ্যের দিকেই থাকে নিবদ্ধ।

কর্মবলে যে ক্রমে অগ্রসর হতে থাকে, তার সকল ব্যবহার ঐ এক লক্ষ্য আশ্রয়েই পায় প্রকাশ। প্রায়ই দেখা যায় যে জড়বৎ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সে পড়ে রয়েছে। কি জাগ্রত কি নিদ্রিত অবস্থায়, সকল ভাবেই সে যেন প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি। ক্রমশ আরো একটি সময় আসে যখন চলাফেরা, শোওয়া-বসা, সকল লোক-ব্যবহারে, সে যেন এক মহা আনন্দের পুতুল। তখন ভিতরে বাইরে সে এক অপূর্ব আনন্দসত্তায় পরিণত হয়ে যায়।

এরপর তার এমন একটা অবস্থা আসে যখন আর তাকে লৌকিক বুদ্ধি-বিচার দ্বারা ধরা যায় না। এইরূপ অবস্থায় তার দেহের সকল স্পন্দন হয়ে পড়ে স্থগিত। সর্বাবস্থায় তখন সে অপরিবর্তিত থাকে। দেহধারী বলে আমরা তাকে দেহীর মত পরিবর্তনশীল মনে করি মাত্র।

আর যোগবলে যারা দেহত্যাগ করে তাদের সহিত সাধারণ সাধকের তফাৎ, যোগীদের স্বেচ্ছায় প্রাণবায়ুর হয়ে থাকে অবসান। আর যাদের মহাযোগ বা নির্বিকল্প সমাধিতে দেহপাত হয়, তাদের স্বকৃত কোন ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে না। পূর্ব পূর্ব সাধন সঞ্চিত কর্মযোগের অবসানে তাদের দেহপাত আপনা আপনিই ঘটে যায়। তাদের জন্ম মৃত্যুর কোন সংস্কার থাকেই না।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কঠিন তত্ত্বকথা সরলভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ভাইজীকে।

তত্ত্বকথা বলতে বলতে মা ভাবস্থ হলেন।

পনেরো

'নামে তন্ময়তা আনতে পারলেই রূপসাগরে ডুব দেওয়া যায়।'

দেওঘর বালানন্দ আশ্রমের প্রাণগোপালবাবুকে শ্রীশ্রীমা বলছেন।

গুরু বালানন্দ ব্রহ্মচারী একজন সিদ্ধপুরুষ। প্রাণগোপালবাবু পেন্সন নিয়ে গুরুর আশ্রমেই থাকেন। সেখানেই নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে। শ্রীপ্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় মায়ের একজন প্রধান ভক্ত।

১৩৩৩ সন বৈশাখ মাস।

ঢাকার ভক্তদের আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে শ্রীশ্রীমা অকস্মাৎ চলে এলেন বৈদ্যনাথ ধামে।

এ ভাঙা হাট আর কোন দিনই তেমন করে জমলো না। এর পরে কত জায়গায় মায়ের কত আশ্রম উঠলো গড়ে। কিন্তু মা যেন আর কখনো কোথাও স্থির হয়ে পারলেন না বসতে।

ধ্যানমন্দিরে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সাথে কথা বলছেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। ব্রহ্মচারীজী খুব খুশি মাকে পেয়ে। হাসতে হাসতে বললেন,—মা, তোমার গাঁটরি খোল।

শ্রীশ্রীমা জবাব দিলেন, —'গাঁটরি তো বাবা খোলাই রয়েছে।' আবার বলছেন শ্রীশ্রীমা,—'এক ছাড়া কিছুই নাই।'

ব্রহ্মচারীজী মানছেন না, বলছেন,—দুই, তিন ও তাঁর মায়া।

মা কিছুতে দুই স্বীকার করছেন না। অনেকক্ষণ তর্কবিতর্কের পর বালানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কথাই নিলেন মেনে।

মা হেসে উঠলেন।

বালানন্দজী খুশি হয়ে মাকে আদর করে কোলের কাছে বসিয়ে ফল খাওয়ালেন।

পরের দিন বালানন্দজী নিমন্ত্রণ করলেন শ্রীশ্রীমাকে ধ্যানমন্দিরে। ভোগ দিলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে। বিশ্বজননী আনন্দবিলাসিনী কুমুদিনীকে। গলায় পরিয়ে দিলেন রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানের জন্য দিলেন একখানি রক্তবস্ত্র।

তারপর শুরু হলো ধর্মালোচনা।

শাস্ত্রের নানা জটিল তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা। মাতৃকণ্ঠ-নিঃসৃত অমৃতময় বাক্য শ্রবণ ক'রে মুগ্ধ হলেন বালানন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীশ্রীমায়ের সব কিছুই অলৌকিক। মা যেন ভক্তিরসপরিপ্লুত অলৌকিক ভাবরাশির অদ্বিতীয় আধার।

মা হলেন ভাবস্থ। ভাবসমাধি।

ব্রহ্মচারী বালানন্দজীর ধ্যানমন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের ভাবাবেশ। ছদ্মবেশী মায়াধিনায়িকা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর অন্তরালে বিশ্বজননী হরমনোমোহিনী নারায়ণীকে নয়নগোচর করে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন বালানন্দজী। ভয়ভীতের ন্যায় যুক্তকরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিশ্বজননী বালানন্দজীর মাথায় হাত রাখলেন। তারপর শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে ব্রহ্মচারীজী কিছুদিনের জন্য গেলেন তপোবনে। তপোবন বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সাধনার স্থান।

এক সপ্তাহ পরেই মা আবার ফিরে এলেন ঢাকায়। আবার শুরু হলো শাহবাগে আনন্দ উৎসব। নামগান। কীর্তন।

শ্রীশ্রীমা আছেন শাহবাগে। হঠাৎ একদিন চলে এলেন সিদ্ধেশ্বরীতে। ভক্তবৃন্দও এসেছেন। মা এসে বসলেন কুণ্ডের মধ্যে।

ভক্তজনেরা সকলেই উপস্থিত। ভাইজী, ভোলানাথ ও গুরুপ্রিয়া দেবীও আছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বধূত্বের সঙ্কোচ এখন আর নেই। মা বললেন,— 'যে যে এখানে আস, সকলকেই তৈরি হতে হবে। এখন পর্যন্তও কিছুই হয়নি, শুধু মাটিতে কোদাল পড়েছে মাত্র। কত সইতে হবে। কত উঠবে ঝড়। সেই বাতাসে যারা যাবার চলে যাবে। যারা

থাকবার তারা থাকবে।' মা দৃঢ়ভাবে এই কথাটি বলেই হেসে উঠলেন।

ভক্তবৃন্দ নীরব।

মা আবার বললেন, দেখ সকলেই প্রায় সাংসারিক বিষয়েই আমাকে প্রশ্ন করে। আমি সে সম্বন্ধে কিছুই বড় বলি না। কিন্তু আজ বলছি আমি যখন এসে এখানে বসবো তখন যে কোন বিষয়ে যে যা প্রশ্ন করবে আমি উত্তর দেব।

এই কথা বলামাত্রই স্ত্রীলোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীও হেসে হেসে প্রত্যেকটির জবাব দিতে লাগলেন। প্রশ্নোত্তরের পর কীর্তন হলো শুরু। রাত্রি অধিক হতে অধিকতর হতে লাগলো। কীর্তনে শ্রীশ্রীমায়ের অদ্ভুত অদ্ভুত ভাব হতে লাগলো। প্রতি মুহূর্তেই হতে লাগলো পরিবর্তন। শ্রীশ্রীমা বিশ্বজননী লীলাময়ী সর্বলোক-শাসনকর্ত্রী কালশক্তি কালীরূপ ধারণ করলেন।

ভাবাবস্থায়ই মা উঠে পড়লেন। গভীর রজনী। সূচীভেদ্য অন্ধকার। মা দ্রুত পদক্ষেপে চলতে লাগলেন। ভক্তবৃন্দও সাথে সাথে চললেন। মা এসে পৌঁছুলেন কালীমায়ের মন্দিরে। মন্দিরে প্রবেশ করে কালীমূর্তি প্রদক্ষিণ করে দরজার সম্মুখে শায়িত হয়ে পড়েই সমাধিস্থ হলেন।

গুরুপ্রিয়াদেবী ও ভোলানাথ শ্রীশ্রীমায়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে মা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে লাগলেন।

মা মৃদুস্বরে ভোলানাথকে বললেন,—'সকলকে বলে দাও আজ যা দেখলো তা যেন কেউ মুখে উচ্চারণ না করে।' এইভাবে অনেক সময় অতিক্রান্ত হলো।

রাত্রি প্রভাত হলো। মা ফিরে এলেন শাহবাগে। ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে নিলেন বিদায়।

এমনই ভাবে শ্রীশ্রীমা নানা লীলা-রহস্যের মধ্য দিয়ে তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করে ভক্তজনদের চঞ্চল লক্ষ্যকে তাঁর বিরাট সত্তার অভিমুখে করেছিলেন আকর্ষণ।

মা বলেন, 'জীবনে ভগবানকে ফুটিয়ে তোলাই মানুষের খাঁটি মনুষ্যত্ব। পাশব জীবন ও সাধনা নিয়ে তার যাত্রারম্ভ, কিন্তু দিব্য ভাগবত জীবন লাভই তার শেষ গন্তব্যস্থান।'

ষোল

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ। ১৩৩৩ সন। ফাল্গুন মাস।

শ্রীশ্রীমা চলেছেন হরিদ্বারে, অমৃতকুম্ভে। কাশী হয়ে যাবেন। সঙ্গে আছেন ভক্তজনেরা। কলকাতায় এসে উঠলেন ভাগ্যকুলের কুণ্ডুদের একটি খালি বাড়িতে। সেখানে রাজা জানকীনাথ রায়ের পুত্র যোগেন্দ্রবাবু শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর জ্যোতির্ময়ীরূপ দর্শন করে হলেন মুগ্ধ। শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে তিনি মাকে নিয়ে গেলেন নিজ গৃহে। সেখানে নামগান হলো। কৃষ্ণ গুণগান। কীর্তন। বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে। শ্রীশ্রীমা ভাবাবেশে হলেন বিভোর। মহাভাবরূপিণী বিশ্বজননীর বিশ্বাতীত সে রূপ দর্শন করে মুগ্ধ হলেন উপস্থিত ভক্তজনেরা।

শাহবাগের মালিক নবাবজাদী প্যারীবানুর গৃহেও কীর্তন হলো। প্যারীবানু পুত্রকন্যাসহ হরিনাম করলেন। গৃহে গৃহে কৃষ্ণনাম পৌঁছে দেওয়াই যেন শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-ব্রত। মুসলমান গৃহে কীর্তন কৃষ্ণ গুণগান। সে এক অভাবনীয়, অনির্বচনীয় দৃশ্য।

মা বলেন, 'সকল ধর্ম সকল পথ সেই একেরই সন্ধানে রত। এক সর্বব্যাপী পরম সৎ-ই সর্বজীবের সর্বসত্তার মূল সত্য। ব্যবহারিক স্থূল জগৎ হতে আরম্ভ করে অনির্বচনীয় পরম রহস্যের সীমানা পর্যন্ত

নির্বিশেষে। সাকার বা নিরাকার। সচেতন বা অচেতন প্রভৃতি যত প্রকার দ্বন্দ্ব, বিরোধ বা বহুত্ব আছে; সে সমস্তই সেই পরমতত্ত্বের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি। অথচ সমস্ত দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্যেও সে তত্ত্ব এক। অখণ্ড। বহুত্বের সমষ্টি নয়। বহু বৈচিত্র্য সেই অবিভাজ্য সত্ত্বা হতে হয়েছে উদ্ভূত। তাকে অবলম্বন করে বর্তমান আছে। এবং তাতেই হবে লয়। ব্রহ্মই সকল প্রকাশ ও ভাবের আদি ও অন্ত। একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই। তিনি **একমেবাদ্বিতীয়ম্**।'

এই তত্ত্বই যেন শ্রীশ্রীমা তাঁর জীবন দিয়ে সকলকে উপলব্ধি করাচ্ছেন।

আবার শ্রীশ্রীমা কলকাতার ভক্তবৃন্দের আনন্দোৎসবকে ভেঙে দিয়ে চলে এলেন কাশীতে। এসে উঠলেন শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের গৃহে। শ্রীশ্রীমার আগমনের দু'দিন পূর্বে কুঞ্জমোহনবাবু সন্ধ্যাবেলা ছাদে হঠাৎ নয়নগোচর করলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে। পরিধানে রক্তবস্ত্র জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। পরে মাকে সেই রূপেই দর্শন করে কুঞ্জবাবু বিস্ময়ে হলেন অভিভূত। রক্তজবা দিয়ে শ্রীশ্রীমাকে তিনি দেবীরূপে করলেন পূজা।

কাশীতে শ্রীশ্রীমা'র আগমন সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকসমাগম হতে লাগলো। দলে দলে ভক্তরা আসতে লাগলো। শ্রীশ্রীমা হাতজোড় করে বসে রইলেন। শ্রীচরণকমল স্পর্শ করে প্রণাম করতে আর দিলেন না বাধা। মা বললেন, 'পূর্বে পা ছুঁইতে দিতে পারি নাই। এখন দেখি হাতও যা—পাও তাই। উভয়ে কোন প্রভেদ নাই। হাত ধরিতে যখন বাধা দেই না, তখন পা ধরিতেই বা বাধা দিবার কি আছে।'

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর অবস্থানে কুঞ্জবাবুর গৃহ কৃষ্ণ নামগানে হয়ে উঠলো মুখরিত। কীর্তনে মেতে মা'র ভাবাবেশ হলো। ভাব-বিহ্বলতা মা ভক্তপরিবৃতা হয়ে আনন্দে হয়ে রইলেন আত্মহারা।

অবশেষে শ্রীশ্রীমা হর-পার্বতীর লীলাভূমি বারাণসী ধামও

করলেন পরিত্যাগ। চলে এলেন হরিদ্বারে। মহাকুম্ভে। কুম্ভযোগের পুণ্যস্নানে।

পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশিগতে গুরৌ।
গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগঃ কুম্ভো নাম তদোত্তমঃ॥

কুম্ভযোগে পুণ্যস্নান। তখন সূর্য মেষরাশিতে। বৃহস্পতি কুম্ভ-রাশিতে অবস্থান করে।

পুরাকালে। সত্যযুগে। সুর ও অসুরগণ অমৃতলাভের জন্য সমুদ্র-মন্থন করতে আরম্ভ করলেন। দেবতা ও অসুরের সেই সমুদ্রমন্থনে উঠলো কত কী ধনরত্ন। আর উঠলো হরমনোমোহিনী লক্ষ্মীদেবী। যাঁকে নিয়ে পড়ে গেল কাড়াকাড়ি। কে পাবে ভাগে! এইসব উঠতে উঠতে এক ভাঁড় অমৃতও উঠলো। অমৃত আর অসুরেরা চিনবে কি করে! তারা তখনও লক্ষ্মীদেবীর মোহে মোহাচ্ছন্ন। দেবরাজ ইন্দ্র তাড়াতাড়ি অমৃতের ভাঁড় পুত্র জয়ন্তের হাতে দিয়ে ইশারা করলেন পালাতে। কথা মতো কাজ। জয়ন্ত ছুটলো ভাঁড় হাতে নিয়ে। অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য অমৃত দেখে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'ধর্ ধর্, ওরে মূর্খ, অমৃত নিয়ে পালালো যে।' সচেতন করে দিলেন অসুরদের। অসুরেরা তখন বুঝতে পেরে ছুটলো। অমৃতের ভাঁড়ের পিছু পিছু। জয়ন্তও ছোটেন প্রাণপণে।

আমাদের এক বছর দেবতাদের এক দিন। জয়ন্ত ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিন দিন সমানে ছুটে এক জায়গায় ভাঁড় রেখে করলেন একটু বিশ্রাম। ওদিকে অসুরেরা এসে প্রায় ধরে ধরে। আবার ছোটেন। আবার তিন দিন পরে ভাঁড় নামান হাত হতে। এই ভাবে তিন দিন পর পর চার জায়গায় জয়ন্ত নামান ভাঁড়। সেই চার জায়গা হলো, হরিদ্বার, নাসিক, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী।

তিন বছর পর পর এইসব জায়গায় হয় কুম্ভযোগ। বারো বছর পর হয় পূর্ণকুম্ভ। মহাকুম্ভের যোগস্নান।

ভক্তবৃন্দসহ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এসেছেন এই পূর্ণকুম্ভের যোগস্নানে। ধর্মশালায় উঠলেন। পূর্বেই ঠিক ছিল।

জগজ্জননী দেখলেন শত শত সাধুর পদযাত্রা। তারপর যোগস্নান করলেন ভক্তবৃন্দ-পরিবৃতা হয়ে। সে এক অভাবনীয়, অনির্বচনীয় মুহূর্ত। তারপর সচন্দন পুষ্প আর পুষ্পমালা দ্বারা অর্চিত হয়ে অপূর্ব শ্রী ধারণ করলেন সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ী।

এইভাবে শ্রীশ্রীমা ভক্তপরিবৃতা হয়ে মহাতীর্থভূমি হরিদ্বারে সাতদিন অবস্থান করে আবার তীর্থযাত্রা করলেন।

যাত্রা হলো শুরু। শ্রীশ্রীমা এলেন হৃষীকেশে। উঠলেন এসে কালীকম্বলীওয়ালার ধর্মশালায়।

ত্রিবেণী ঘাটে এসে মা'র হলো ভাবাবেশ। এই ত্রিবেণী ঘাট পরম পবিত্র স্থান। সীতা উদ্ধারের পর শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতাদের সহিত এই স্থানে তপস্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করেন, যুদ্ধে প্রাণিহত্যা করেছিলেন বলে।

এর পর এলেন লছমনঝোলার পবিত্র ভূমিতে। পৃথিবীর মাটির সঙ্গে গঙ্গার সর্বপ্রথম যোগ এই পুণ্যভূমিতে। এখানে গঙ্গার উদ্দাম গতি। নীল জলধারা ছুটে চলেছে উচ্ছলিত ভঙ্গিতে। যেন কৃষ্ণের বাঁশীর সেই মর্মান্তিক সুর পেয়েছে শুনতে।

সেই সর্বনাশা ডাক। যে ডাক শুনতে পেলে, কুলবধূর কূল যায় ভেঙে। সাংসারিক সুখ-দুঃখ আর দেয় না সাড়া।

যে ডাক শুনতে পেলে মানুষ হয়ে যায় ছন্নছাড়া। গৃহহারা। যে ডাক শুনে একদিন কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ, উত্তর কোশলের রাজধানী অযোধ্যা, নদীয়ার শচীমায়ের স্নেহনীড়, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমকুঞ্জ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীমাও শুনলেন সেই মর্মান্তিক সুর। কৃষ্ণের বাঁশীর সেই সর্বনাশা ডাক। দেবতার আহ্বান।

আদ্যাশক্তিরূপিণী মহামায়া শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর হলো ভাবাবেশ। ভাব-বিহ্বলতা। ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমা পরমেশ্বরী গঙ্গারূপ ধারণ করলেন। ভক্তজন শ্রীশ্রীমায়ের এই অনির্বচনীয় রূপ দর্শন করে হলেন মুগ্ধ।

*　　　*　　　*

এবারে শ্রীশ্রীমা এলেন বৃন্দাবনে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমি দর্শনে। বৃন্দাবন প্রেম সরোবর শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের লীলাস্থল। লীলায় ছাওয়া এই বৃন্দাবন। সেই যমুনাপুলিন। যেখানে কৃষ্ণ পুলিন বিহার করেছিলেন। সেই কেলিকদম্ব। যে গাছে উঠে কৃষ্ণ কালিয়দহে ঝাঁপ দেন।

নিধুবন। নিকুঞ্জবন। রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলাস্থল।

সচ্চিৎ আনন্দময় শ্রীবৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ-বিহারের পরমমোহন ॥
মহারাসস্থলী হয় যমুনা পুলিনে।
যাহা রাসক্রীড়া শতকোটী গোপীসনে ॥

বৃন্দাবনের কুঞ্জঘেরা পথে পথে শ্রীশ্রীমা 'আনন্দময়ী' ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ব্রজের সেই মাঠ। সেই গাছপালা। পাখী, হরিণ, ময়ূর, ময়ূরী। সবকিছুই আছে। শুধু নেই কৃষ্ণ।

এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতে শ্রীশ্রীমা ভাবে হলেন বিভোর। ভাব-বিহ্বলতা। কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর হয়ে ডাকতে লাগলেন, কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! দেখা দাও! দেখা দাও!

নয়নজলে ভাসতে লাগলেন। হৃদয় উদ্বেল। ভাব ও ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে উঠলেন।

আনন্দময়ীর মা'র ভাবাবেশ হলো, শ্রীরাধারাণী ও মুরলীধর শ্যামসুন্দরের নিত্যলীলাস্থল বৃন্দাবনের পথে। সে এক অনির্বচনীয়, অভাবনীয় দৃশ্য।

এই হলো মুক্তলতা। কৃষ্ণ পুঁতে দিয়েছিলেন মাটিতে। মা যশোদার কানের মুক্তা। তাই থেকে এত লতা। ব্রজে গাছের চেয়ে লতা বেশি। কেবলই লতা। লতা নয় ত যেন কমলিনী রাই। রাইকমলিনী। সখী। সবই যেন সখী ভাব। রাধারাণীর ভাব।

আর এই হলো তমাল বৃক্ষ। কৃষ্ণ ননী খেয়ে এই গাছে হাত মুছেছিলেন। কেমন গর্ত হয়ে গেছে গাছে।

এই তো সেই সেবাকুঞ্জ।

রোজ রাত্রে কৃষ্ণ আসেন লীলা করতে। শ্রীরাধা তখন কাউকে দেন না থাকতে। নিজ হস্তে ভিতর হতে দেন কুঞ্জের দরজা বন্ধ করে।

ব্রজের সব কিছুই আছে। শুধু নেই কৃষ্ণ। ব্রজের প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে ভক্তপ্রাণের মহিমা। একদিন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সর্বাঙ্গে মেখেছিলেন এই ধূলি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ব্রজের ধূলি সর্বাঙ্গে মেখে উন্মত্তের মত কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! বলে ছুটে গিয়েছিলেন যমুনাপুলিনে।

আজ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীরও সেই ভাব। ভাবোন্মাদনা। ভাব-বিহ্বলতা।

আনন্দময়ী রাইকমলিনী। কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী ব্রজগোপিনীর ভাব। কৃষ্ণচিন্তানিরতা শ্রীমতীর ভাব। মহাভাবভাবিনী। মধুর ভাবের সর্বস্বত্বাধিকারিণী শ্রীশ্রীরাধারাণীর ভাব।

মথুরাতে মা এসে দেখলেন মথুরানাথকে। রাখাল রাজা কৃষ্ণকে।

ধ্রুবঘাট। বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে এইখান হতে পার হয়েছিলেন।

গিরি-গোবর্ধন। মানস-গঙ্গা। পাশাপাশি দুই কুণ্ড। শ্যাম কুণ্ড। রাধা কুণ্ড। চৈতন্য মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী উদ্ধার করতে এসে এখানকার মাটি নিয়ে তিলক কাটলেন কপালে।

শ্রীশ্রীমাও কপালে তিলক কাটলেন। রাধাকৃষ্ণ সখীদের নিয়ে

কুণ্ডে জলকেলি করতেন। কুঞ্জে কুঞ্জে দোল খেতেন। কোথাও শিঙ্গার। কোথাও করতেন বিশ্রাম।

কুঞ্জে কুঞ্জে ঘেরা শ্রীধাম বৃন্দাবন। কত কুঞ্জ! শ্রীললিতার কুঞ্জ। শ্রীবিশাখার কুঞ্জ। চম্পকলতার কুঞ্জ। সুচিত্রার কুঞ্জ। তুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জ। ইন্দুরেখার কুঞ্জ। রঙ্গদেবীর কুঞ্জ। সুদেবীর কুঞ্জ।

আবার কত মঞ্জরী!

রূপমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, মঞ্জুনালী, রসমঞ্জরী, শ্রীকস্তুরিকা, গুণমঞ্জরী, প্রেমমঞ্জরী।

কত সখী! নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী।

ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মূরতি,
মধুরা শ্রীমতী বামে বিহরতি।

ব্রজধামের রসসিন্ধু মুরলীধর শ্যামসুন্দরের লীলামাধুর্য পান করছেন আজ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা। শ্রীগৌরসুন্দরের মত রাধাভাবে বিভোর হয়ে আছেন। ঢুলু ঢুলু ভাব। গুণ গুণ স্বরে কৃষ্ণনাম করছেন। যেন তাঁর মনভৃঙ্গ শ্যামরস পানে মত্ত হয়ে রয়েছে।

নানা পুষ্প তরুলতা কুঞ্জে বিকশিত।
নানা পুষ্প গন্ধে কৃষ্ণ হইল মোহিত॥
মধুর কোকিলা ভৃঙ্গ পক্ষী সুকুমারী।
নানাবিধ ভাবে আছে সেই কুঞ্জ ভরি॥
এই অষ্ট সখীর যে হয় অষ্ট কুঞ্জ।
সেই স্থানে রাধাকৃষ্ণের লীলারস পুঞ্জ॥
সূর্য পূজা ছলে শ্রীরাধিকা সখীগণে।
এই কুঞ্জে দিবা-বাস কৈলা কৃষ্ণ-সনে॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন রসরাজ কৃষ্ণ কুঞ্জে কুঞ্জে লীলা করছেন। রাধারূপ সরোবরের সোনার কমলে কৃষ্ণভৃঙ্গ পতিত হয়ে মধু পানে উন্মত্ত হয়ে রয়েছেন। মহাভাবময়ী মা আনন্দময়ী রাধাশ্যামের সেই অপ্রাকৃত লীলা ভাব চক্ষে নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হলেন।

অবশেষে রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী মথুরা বৃন্দাবন পরিক্রমা করে চিরন্তনী বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা আবার ফিরে এলেন ঢাকায়। শাহবাগে। লীলাময়ী মা কৃষ্ণলীলায় মেতে উঠলেন। নিজেও মাতলেন, ভক্তদেরও মাতালেন।

* * *

ভক্তপ্রবর শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র রায় খুবই অসুস্থ। শ্রীশ্রীমা প্রতিদিনই একবার তাঁকে দর্শন দেন এবং প্রসাদ পাঠিয়ে দেন। কৃপাময়ী মা আনন্দময়ীর কৃপায় ভাইজী ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

ভাইজীর আকুলতা দেখে শ্রীশ্রীমা বললেন, আকুল ভাবই পূজা-অর্চনার প্রাণ। অন্তরেই মহাশক্তির প্রস্রবণ এবং সকল চেষ্টাতেই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের মূল বিদ্যমান।

সতেরো

১৩৩৪ সন।

নবাবজাদী প্যারীবানুর পুত্র-কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা এসেছেন কলকাতায়। ভোলানাথ ও গুরুপ্রিয়া দেবীও আছেন সাথে। নবাবজাদী প্যারীবানু শ্রীশ্রীমায়ের প্রধান ভক্ত।

একদিন কীর্তনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তীদেবী ও জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণাদেবী।

কীর্তনের আসরে শ্রীশ্রীমা বসে আছেন। পরিধানে লালপাড়ের শাড়ি। কপালে বড় সিন্দুরের ফোঁটা। স্থূলদেহধারী মা নন, যেন দেবী ভগবতী মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণা হয়েছেন। এমনই অলৌকিক মাধুর্য ফুটে উঠেছিল শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর মুখমণ্ডলে।

বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে বাসন্তীদেবী স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর দিকে। দৃষ্টি ফেরাতে পাচ্ছেন না, কেমন যেন ভাব-বিহ্বলতা।

সকলে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বাসন্তীদেবীকে প্রশ্ন করায়, তিনি বললেন, —অনেক দিনের কথা, আমার ঠিক মনে নাই। তবে এই মূর্তিই যেন আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমাকে বলছেন, 'তুমি সাবধান হও, তোমার ভয়ানক বিপদ আসছে।'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ছবিতে দাশ মহাশয়ের সহিত তাঁর স্ত্রীকে দেখে মা বলেছিলেন, 'এই মেয়েটির সমূহ বিপদ আসছে। ইনি শীঘ্রই বিধবা হবেন।' তখন পর্যন্ত মা এঁদের পরিচয় জানতেন না।

বিস্ময়ে ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বাসন্তীদেবী আদর করে শ্রীশ্রীমাকে কোলে নিয়ে বসলেন। কীর্তন হলো শুরু। অপর্ণাদেবী শোনালেন কীর্তন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে। নবাবজাদীও পুত্রকন্যাসহ কীর্তনে যোগ দিলেন। কীর্তনে মা'র ভাবাবেশ হলো। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য!

কিছুদিন পর প্যারীবানু ছেলে-বউ ও মেয়ে-জামাতাসহ ঢাকায় এলেন। শ্রীশ্রীমাও ফিরে এলেন শাহবাগে। ঢাকায় এসে প্যারীবানু শ্রীশ্রীমায়ের নিকট প্রসাদ ভিক্ষা করলেন। শ্রীশ্রীমা পূরণ করলেন ভক্তমনোবাঞ্ছা। মা নিজ হস্তে রান্না করে, নবাবগৃহের সকলকেই নিমন্ত্রিত করলেন। মহা আনন্দে সকলে খাওয়াদাওয়া করলেন। শ্রীশ্রীমা জগজ্জননী যখন যা করেন সবই যেন পূর্ণ। নবাবের বাড়ির সকলকেই খাওয়াচ্ছেন, সে কাজেও ত্রুটি নাই।

নবাবজাদী প্যারীবানু নিজ হস্তে কালীপ্রতিমার কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন স্বর্ণহার।

* * *

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ভক্তবৃন্দ-পরিবৃতা হয়ে হঠাৎ একদিন বেরিয়ে

পড়লেন কামাখ্যা দর্শনে। কাশী হতে এলেন কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়। কলকাতা হতে এলেন সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীবাবু, চারুবাবু আরও অনেক ভক্তজন। মহা-আনন্দে কামাখ্যা দেবীর দর্শনলাভ হলো। সমস্ত কামাখ্যা পাহাড়টি যেন পবিত্র সত্তায় পরিপূর্ণ। এই পবিত্র ভাবের প্রভাবে শ্রীশ্রীমা'র হলো ভাবাবেশ। ভাবাবেশে মা দর্শন করলেন শত শত দেবদেবী আর মহাতপস্বী মুনিঋষিদের।

এই কামাখ্যা পাহাড়েই শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ জগজ্জননী আনন্দময়ী মাকে মহাদেবী রূপে পূজা করলেন। শ্রীশ্রীমা হলেন সমাধিস্থ। বহুক্ষণ ঐ ভাবেই রইলেন।

ঐ সময় বিশ্বজননীর ভাবঘন অলৌকিক মূর্তি নয়নগোচর করে ভক্তজন হলেন মুগ্ধ।

যে ঘরে পূজা হলো, সেই ঘরের বারান্দার অনতিদূরে বলি হলো। শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথই বলি দিলেন।

সমাধিভঙ্গের পর মা বললেন, 'বলির রক্তের ফোঁটা আমার লাগিয়াছে, বুঝিয়াছি।'

এই কথায় ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হলেন, কারণ এতদূরে রক্ত আসার কথা নয়। যিনি ত্রিগুণের অধীশ্বরী হয়েও প্রলয়কালে তমোময়ী, তামসীদেবী, কালী মহাকালী, দেবীরূপে প্রকটিতা, সেই ত্রিগুণাধীশ্বরী, স্থিতিসংহারকারিণী, বিশ্বেশ্বরী ভগবতীর ইচ্ছাই হলো পূর্ণ।

পূজার পর আরও কয়েকদিন শ্রীশ্রীমা ভক্তজনপরিবৃতা হয়ে কামাখ্যা পাহাড়ে মহানন্দে অতিবাহিত করলেন।

ঢাকায় ফিরবার পথে মা লামডিং দিয়ে পিরোজপুর বাইসারী হয়ে ফিরলেন।

পিরোজপুরের মুন্সেফ দীনেশচন্দ্র রায় শ্রীশ্রীমাকে আহ্বান করে নিলেন। দীনেশবাবু মায়ের একজন প্রধান ভক্ত। অবশেষে ভক্তের আহ্বানে মা এসে পৌঁছালেন পিরোজপুরে। নৌকা ঘাটে লাগতেই

কীর্তনের সুমধুর ধ্বনি করতে করতে পিরোজপুরের ভক্তবৃন্দ এসে মাকে নামিয়ে নিলেন। মালা-চন্দনে শ্রীশ্রীমাকে সাজিয়ে সকলে মধুরস্বরে কীর্তন করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীমা'র হলো ভাবাবেশ।

নেত্র অর্ধনিমীলিত। শরীর অবশ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব।

শ্রীশ্রীমা দিব্যভাবের তালে নৃত্য করতে করতে কীর্তনের সঙ্গে চললেন। শ্রীশ্রীমায়ের সেই দিব্যজ্যোতির্ময়ী মূর্তি দর্শন করে ভক্তবৃন্দ হলেন অভিভূত। সকলেই সেই অলৌকিক মূর্তি দেখছেন আর আনন্দে বিভোর হয়ে কীর্তন করছেন। অবশেষে মা এসে পৌঁছুলেন নির্দিষ্ট স্থানে। কীর্তন বন্ধ হলো না। কীর্তন চলতে লাগলো। একই ভাবে। ভোগ হলো। মা কিছুই মুখে দিলেন না। ভাবাবস্থায়ই রইলেন। এইভাবে দুইদিন অতিক্রান্ত হলো। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর কর শ্রীশ্রীমাকে নিজ গ্রাম বাইসারীতে নিয়ে গেলেন। সেখান হতে শ্রীশ্রীমা গেলেন সোহাগদল গ্রামে।

লোকমাতা শ্রীশ্রীআনন্দময়ী ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবার মানসে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যাত্রা করলেন শুরু। কোথাও পদযাত্রা। কোথাও নৌকায়। সাথে সাথে চলেছেন ভক্তবৃন্দ। কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ সকলে মিলে করছেন কীর্তন। শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দের ভাবানুযায়ী এক অপরূপ মূর্তিতে হতে লাগলেন প্রতিভাত।

এইভাবে অপূর্ব প্রাণের খেলা খেলে বিশ্বজননী, ভক্তপ্রাণরূপা, যোগিজনমনোরঞ্জিনী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ঢাকায় এলেন ফিরে। সাধারণ হাসি খেলার মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের যে কত অসাধারণ শক্তি প্রকাশিত হচ্ছে তার নেই ইয়ত্তা।

এসব বিষয়ে শ্রীশ্রীমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে মা বলেন, —'সাধারণ অসাধারণ সব তোদের কাছে, আমি সকল সময় সকল অবস্থায় একভাবেই রয়েছি।'

আবার বলেন, 'সবই তো খেলা। তোদের খেলার সাধ আছে, তাই হাসি তামাসাতেও এই শরীরটাকে তোরা টেনে নিয়ে যাস। যদি ইহা স্থির ধীর গম্ভীর হয়ে বসে থাকতো, তবে তোরা যে দূরে সরে থাকতিস। বেশ সুন্দর ক'রে আনন্দের খেলা খেলতে শেখ্। তাহলে খেলার ভিতর দিয়েই খেলার চরম পাবি—বুঝলি? যারা কিছু করতে অক্ষম, যাদের ধর্মজীবনের কোনও সহায় নাই, তাদেরই আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

১৩৩৫ সন। বৈশাখ মাস।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর জন্মোৎসব আরম্ভ হলো। সিদ্ধেশ্বরীতে শ্রীশ্রীমা'র প্রথম জন্মোৎসব। কাশী কলকাতা ও ঢাকার ভক্তমণ্ডলী একত্রিত হয়েছেন। আর আছেন ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত, যোগেশ ব্রহ্মচারী ও অতুল ব্রহ্মচারী। অখণ্ডভাবে নামগান চলতে লাগলো। জন্মতিথিতে জন্মসময়ে ভোলানাথই শ্রীশ্রীমাকে পূজা করবেন স্থির হলো।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ নিমাই সন্ন্যাস ; মানভঞ্জন, মাথুর প্রভৃতি কীর্তন গেয়ে সমাগত ভক্তবৃন্দকে কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর করে তুললেন। শ্রীশ্রীমা স্থিরভাবে বসে কীর্তন শুনতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে মা ভাবাবিষ্ট হলেন। ভাবোন্মাদনা। ভাবসমাধি।

রাত্রি শেষ প্রহরে বাবা ভোলানাথ পূজায় বসলেন। জ্যোতির্ময়ী জগজ্জননীর পূজা। শক্তিরূপিণী, সংসারত্রাণকারিণী, দেবী, মহাদেবী, শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর পূজা। ষোড়শোপচারে পূজা। ভক্তবৃন্দ স্তব্ধ হয়ে সে অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগলো। পূজা করতে করতে ভোর হলো। শ্রীশ্রীমা তখনও ভাবাবেশে আচ্ছন্ন। কীর্তন বন্ধ হলো না। চলতে লাগলো।

ধীরে ধীরে মা উঠে বসলেন। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হলেন।

হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছেন। পবিত্র হাসির প্রভাবে শ্রীশ্রীমা'র মুখমণ্ডলে ফুটে উঠলো এক অলৌকিক মাধুর্য।

পিতৃদেব বিপিনবিহারীও ভাবে বিভোর হয়ে কীর্তন করছিলেন। শ্রীশ্রীমা, পিতৃদেবের কণ্ঠদেশ ফুলমালায় বিভূষিত করে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

বিপিনবিহারীও মহানন্দে নৃত্য করতে করতে কীর্তন করতে লাগলেন।

হরি নামের মালা নিতাই দিল আমার গলে,
হরি নাম মন্ত্র দিল স্নান করায়ে গঙ্গাজলে।

কৃষ্ণকীর্তনে এক অপূর্ব, অভাবনীয় পরিবেশের হলো সৃষ্টি।

তার পর বাউলবাবু ফুলের সাজে সাজালেন শ্রীশ্রীমাকে। মাথায় দিলেন ফুলের মুকুট। হাতে পায়ে ফুলেরই গহনা; আর গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা। অপরূপ সাজে সজ্জিতা হলেন শ্রীশ্রীমা। জগতের জননী আনন্দময়ী মা।

শ্রীশ্রীমায়ের সেই পবিত্ররূপ দৃষ্টিগোচর করে এক অনির্বচনীয় নির্মলতা অনুভব করে আনন্দলাভ করলেন ভক্তজনেরা।

শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা বালক ভাবে দেখে অভিভূত হতেন। শ্রীদাম সুদামের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের সখ্য ভাবের মধুরতা উঠতো ফুটে। গোপিনীরা বিভোর হয়ে থাকতেন কান্ত ভাবে। তেমনই শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দের ভাবানুযায়ী এক এক অপরূপ মূর্তিতে হতে লাগলেন প্রতিভাত।

টাঙ্গাইল থেকে ফিরে শ্রীশ্রীমা এসে উঠলেন 'উত্তমা' কুটীরে। এখানে কালীমূর্তিও আনা হয়েছে। ঢাকেশ্বরীর বাড়ির নিকটে। সৌন্দর্যমণ্ডিত গৃহ। গৃহ নয়, যেন মন্দির। দেবী মহাদেবী, হরিনেত্রকৃতালয়া শ্রীশ্রীজগদীশ্বরীর মন্দির। এখানেই টাকীর সূর্যকান্তবাবু সপরিবারে এসে মাকে দর্শন করলেন। পুত্র-বিয়োগে

তিনি কাতর ছিলেন। শ্রীশ্রীমা জগজ্জননীর চরণকমলে পূজা দিয়ে তাঁরা মানসিক শান্তি লাভ করলেন।

শ্রীশ্রীমা এখন সর্বদাই ভাবাবেশে, ভাব-সমাধিতে মগ্ন। অদ্বৈত আত্মানন্দ রসে বিভোর॥ কখনো জীব ভাব। কখনো ঈশ্বর ভাব। কখনো আবার ব্রহ্ম ভাব। কখনো বা ভক্তদের সদ্‌বুদ্ধি ও শুদ্ধ ভাবের প্রমোদনার জন্য নানারূপ অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ হতে লাগলো।

মা বলেন, 'এই শরীর তো একটা ঢোল। তোরা যে তালে বাজাবি, সেরূপ আওয়াজ পাবি। আমি তো দেখতে পাই সর্বত্রই একেরই তো খেলা চলছে।'

একদিন এই উত্তমা কুটীরেই দিব্য ভাবের তালে তালে নৃত্য করতে করতে শ্রীশ্রীমা কীর্তন করতে লাগলেন। রুক্ষ, আলুথালু চুল, এলোমেলো বেশ—যেন কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী রাই-কমলিনী। শ্রীরাধারাণীর ভাব। এমনই সময় শ্রীশ্রীরামঠাকুর এলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে দর্শন করতে। মায়ের ঐ ভাবঘন মূর্তি নয়নগোচর করে শ্রীশ্রীরামঠাকুর হলেন অভিভূত। দেবী ভগবতী বলে মাকে সাষ্টাঙ্গে করলেন প্রণাম।

বিশ্বজননী, ত্রিলোকতারিণী, কৈবল্যদায়িনী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রণাম গ্রহণ করলেন পরমযোগী শ্রীশ্রীরামঠাকুরের।

সে এক অনির্বচনীয়, অভাবনীয় দৃশ্য।

আঠারো

এস হে গৌর বস হে গৌর আমার হৃদয় প্রাঙ্গণে,—

কীর্তন শোনাচ্ছেন যোগেন রায় কাশীতে কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের গৃহে। কুঞ্জবাবুর আহ্বানে মা আবার এসেছেন কাশীতে। কুঞ্জবাবু মায়ের প্রধান ভক্ত। স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সহোদর

শ্রীশ্রীগুরুপ্রিয়া দেবীর পিতৃব্য। কুঞ্জবাবুর পঞ্চম পুত্র 'মন্নু'র সর্পাঘাতে মৃত্যুর হাত হতে শ্রীশ্রীমা মন্নুর জীবন রক্ষা করেছিলেন। তাই তিনি দেবী ভগবতী রূপে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে পূজা দিচ্ছেন যোড়শোপচারে।

বহু লোক-সমাগম হয়েছে। কীর্তনে মায়ের ভাবোন্মাদনা হলো। ভাবসমাধি। ভাবে বিভোর হয়ে অনেক সময় পড়ে রইলেন। পরে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ পূজা শুরু করে দিলেন। কীর্তন বন্ধ হলো না। ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমায়ের মুখে চোখে অস্বাভাবিক জ্যোতি ফুটে উঠলো। শ্রীমুখে মৃদু মৃদু হাসি। অপরূপ শোভা।

কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এসেছেন। শ্রীশ্রীমাকে দেখছেন। প্রথম দর্শন।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর মুখমণ্ডলের অলৌকিক মাধুর্য নয়নগোচর করে তিনি বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। স্থূলদেহধারী কোন মানবী সাধিকাকে দেখছেন না, যেন স্বয়ং দেবী ভগবতীকে এই ধরণীতে নয়নগোচর করছেন। অভাবনীয় অনির্বচনীয় সে দৃশ্য।

শ্রীশ্রীমায়ের মুখনিঃসৃত স্তোত্রাদি শুনে তিনি বললেন, "ইহা প্রকৃত দেবভাষা, মর্ত্যলোকের সংস্কার লইয়া ইহা বুঝা অসম্ভব।" পরবর্তীকালে ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ 'আনন্দময়ী মা' সম্বন্ধে বলেন, "তাঁহার স্থিতি অটল। দেহ নানা সময়ে নানা সাজে সাজিয়াছে বটে—যখন যে ভাবে সাজিয়াছে তখন সেই অভিনয়ই যথাবৎ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি জানেন,—তিনি যেখানে আছেন, সেইখানেই আছেন। সেইখানে থাকিয়াই সাক্ষীরূপে নির্বিকার ভাবে দেহ ও দেহাশ্রিত সংস্কারের অভিনয় দেখিয়া যাইতেছেন। এই যে ক্রিয়ার মধ্যে অকর্তা হইয়া শুধু দ্রষ্টারূপে অবস্থান, ইহা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। ইহা সাধারণ বুদ্ধির অতীত রহস্য।"

শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দ-পরিবৃতা হয়ে বলছেন, বাসনাই দুঃখের কারণ,

তাঁকে প্রাপ্তির ইচ্ছাই সুখ। ভগবান ধুয়ে মুছে তাঁর কোলে নেন কি না। এই কষ্ট যে সুখের জন্য। সর্বদা তাঁকে স্মরণ রাখো।

আবার বলছেন, বিপদের সময় ধৈর্য ধরা চাই। আপদ বিপদ মানুষেরই আছে। উহাতে যে বীর ধীর হতে পারে সেই জিতে যায়। সময় এক রকম থাকে না। এই সময় তাঁর উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে কাটানো দরকার। কে জানে তিনি কি বিপদ দিয়া কি বিপদ কাটাইয়া দেন। কোন কোন সময় তিনি বিপদ দিয়াই বিপদ হরণ করেন। এই জন্য তাঁর নাম বিপদভঞ্জন।

প্রতিদিন বৈকালে খোলা জায়গায় সভা করে শ্রীশ্রীমাকে বসানো হলে ভক্তসমাগম হয়। ভক্তবৃন্দের মধ্য হতে প্রশ্ন হয়, শ্রীশ্রীমা করেন মীমাংসা।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় একখানি পাখা হাতে করে মাকে বাতাস করছেন আর শুনছেন শ্রীমুখের কথামৃত।

ভগবৎকৃপা সম্পর্কে মা বলছেন, 'কৃপা যে অহৈতুকী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। কৃপা না থাকলে তোমরা থাকতে কোথায়? করুণাসাগর তিনি। তোমাদের শূন্য ঘট পূর্ণ করবার জন্য তাঁর আগ্রহের সীমা নেই। তোমরা নিতে জানো না এই তাঁর দুঃখ। তোমাদের একেই তো সব ছোট্ট ছোট্ট আধার। বেশী কৃপা ধরে না। তার উপর আবার নিজের ঘট উল্টো করে রেখেছো— যেটুকু কৃপা পাচ্ছ তাও পড়ে যাচ্ছে, ধরে রাখতে পারছো না। হঠাৎ যদি কৃপার বন্যা এসে পড়ে তুমি তো তা সহ্য করতে পারবে না। তোমার যে এখনও সময় হয়নি। তোমার যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু পাচ্ছ। যেটুকু আকাঙ্ক্ষা সেটুকু পাবে।'

কৃপাই তো অনেক সময় দুঃখের বেশে বিপদের বেশে দেখা দেয়। মা যেমন কতো সময়ে ছেলেকে থাপ্পড় মেরে শিক্ষা দেয়। তেমনি ভগবানের থাপ্পড়কে যে কৃপা বলে চিনতে পারে সেই ব্যক্তিই কৃপার উপযুক্ত পাত্র।

সব সময় ধৈর্যের আশ্রয় কর্তব্য। হে ভগবান, তুমি যা কর সবই মঙ্গল। সহ্য করবার শক্তি প্রার্থনা কর। ভগবৎকৃপা বিনা কিছুই নাই। সবই ভগবৎকৃপা। ধৈর্যের আশ্রয়ে সব সহ্য করিয়া তাঁর নাম নিয়া আনন্দে থাকা।

* * *

এইভাবে ভক্তদের নিয়ে নানা খেলা খেলে কৃপাময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কাশীর আনন্দের হাট ভেঙে দিয়ে চলে এলেন ঢাকায়।

ঊনিশ

"চেষ্টা করতে করতে বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ ভাবের হয় উদয়। এই বিশুদ্ধ ভাবটা যে কি তা কথায় প্রকাশ করা যায় না। যখন মনে ঐ ভাবের উদয় হয় তখনই বুঝা যায়। এই বিশুদ্ধ ভাব জাগলেই লোকে বুঝতে পারে চেষ্টা বা কর্মের মধ্যে কোনও সার নেই। তখন সে ভগবানের হাতে পুতুলের মত হয়ে যায়। তিনি যে ভাবে নাচান সেই ভাবে সে নাচে।

এই বিশুদ্ধ ভাব জাগাতে হলে একটা পথ অবলম্বন করে থাকতে হয়। সে ভাবটা দ্বৈত ভাবেরই হোক কি অদ্বৈত ভাবেরই হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

'আমিই সব।' আমিই সব। 'তুমিই সব।' তুমিই সব। এই রকম একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। এই ভাবে থাকতে থাকতে দেখা যায় যে তখন আর দুটি নেই। 'আমি' আছে অথবা 'তুমি' আছে। এক অখণ্ড সত্তায় তখন সব কিছু লয় হয়ে যায়। ইহাই ব্রহ্মের অনুভূতি। ইহাই ভগবান লাভ করা। কথায় প্রকাশ করা যায় না। কথার মধ্যে আসলেই খণ্ড হয়ে যায়।

ভাষা ত ভাষাই। সেই জন্যই বলা হয় জীব হলে শিব হওয়া যায় না।

জীব ভাবটা কি রকম,—না মাঠের মধ্যে বেড়া দিয়ে ঘর করার মত। মাঠ ত পড়ে আছেই। বেড়া দিয়ে ঘর করলেও ঐ ঘরের মধ্যেও মাঠ। বাইরেও মাঠ। আবার বেড়া ভেঙে দিলে যে মাঠ সেই মাঠই। তাই বলি লাভালাভ বলে কিছু নেই। জীবও স্বরূপতঃ ভগবান। শুধু বন্ধনের জন্য তাকে জীব বলা হয়। বন্ধনটি খুলে গেলে সে যে ভগবান সেই ভগবানই থাকে। সেই জন্য আবার বলা হয় যে, যত জীব তত শিব।

এই জীব ভাবকে নদীর তরঙ্গের সঙ্গেও তুলনা করা যায়। নদীর জলে ওঠে ঢেউ। এই ঢেউগুলি জীব। আর জল হলো ভগবান। ঢেউ কিন্তু জলে ওঠে এবং প্রকৃতপক্ষে তা জল ছাড়া কিছুই নয়। সেই রকম জীবের স্থিতি ভগবানে এবং প্রকৃতপক্ষে সে ভগবানই। তবে আমাদের ভেদবুদ্ধি আছে বলে আমরা ঢেউকে জল থেকে আলাদা ভাবি। তা না হলে ঢেউ ও জলের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। এই প্রভেদ উপরে উপরে দেখা যায়। বস্তুর অন্তস্তলে সেই একত্ব বিরাজমান। জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নেই। আমাদের অজ্ঞানতাই কেবল সৃষ্টি করেছে প্রভেদ।

হেসে হেসে সহজ করে গভীর তত্ত্বকথা মা বলছেন ভক্ত ব্যারিস্টার শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল রায়কে। ঢাকায়। শাহবাগে। আরও অন্যান্য ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে মায়ের মুখনিঃসৃত অমৃত রসধারা পান করছেন। বসে আছেন শ্রীযুত নিশিকান্ত মিত্র, শ্রীযুত ভবানীচরণ নিয়োগী, অধ্যাপক শ্রীযুত অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, শ্রীযুত অবনীমোহন বসু, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুত নিরঞ্জন রায়, শ্রীযুত ভূপতিনাথ মিত্র, প্রতাপবাবু, মতিবাবু, কুলদাবাবু, জিতেনবাবু, ক্ষিতীশবাবু, প্রমথবাবু ও আরও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ। (পরবর্তীকালে শ্রীযুত অমূল্য-কুমার দত্তগুপ্ত মাতৃনামে বিভোর হয়ে 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থ রচনা করে মায়ের চরণে সমর্পণ করেন)। মা আবার বলছেন, জীব স্বভাবতঃই আনন্দ চায়। তার ভিতরে এই আনন্দ

আছে বলেই ত সে চায়। তা না হলে সে চাইত না। সে যে আনন্দ না চেয়ে থাকতে পারে না। লক্ষ্য করলে এই আনন্দ ও শান্তির আকাঙ্ক্ষা সমস্ত জীবের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। পোকা মাকড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীও তাপের দিকে যেতে চায় না। তারাও চায় শান্তি। আরাম। মানুষও তাই ত্রিতাপ জ্বালায় তাপিত হয়ে শান্তির স্থল, আনন্দের আকর ভগবানকে খোঁজে। ত্রিতাপ হতে রক্ষা পেতে হলে অন্য তাপের সাহায্য নিতে হয়। তাপ দিয়েই তাপকে জয় করতে হয়। একেই বলে তপস্যা। তাপ সহ্য করাকেই আমি বলি তপস্যা। সংসারে তাপ ভোগ করাতে যে রকম কষ্ট, প্রথম প্রথম ভগবানের নাম নেওয়াতেও সেই রকম কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট হলেও এই কষ্ট দিয়েই ত্রিতাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়। কাজেই চাই চেষ্টা। চাই কর্ম।

পশুপক্ষীর মধ্যে ভগবানকে পাওয়ার জন্য কোন গরজ নেই। এই শুভ ইচ্ছা একমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে। জীবকে ভগবান অজ্ঞানের পরদা দিয়ে ঢাকলেও আবার জ্ঞানের দরজাও রেখে দিয়েছেন। সে ঐ দরজা দিয়েই মুক্ত হতে পারে। তবে পরমবস্তু পেতে হলে, ভগবানকে পেতে হলে জ্ঞান ও অজ্ঞানের উপরে উঠতে হবে। যতক্ষণ জ্ঞান ও অজ্ঞান আছে, ভেদবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। যখন পাওয়া যায় তখন সমস্ত ভেদ-জ্ঞান লয় হয়ে যায়।

মা এবারে বলছেন ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে। ভক্তরা প্রশ্ন করছেন আর মা আনন্দময়ী মধুর হাসি হেসে মিষ্টি করে প্রসন্ন স্বরে উত্তর দিচ্ছেন।—

ব্রহ্মের স্বরূপ বা স্বভাব প্রকাশ করা যায় না। কারণ স্বভাব বলতে গেলেই অভাব এসে পড়ে। ভাষার মধ্যে তাঁকে আনতে গেলেই তিনি হয়ে পড়েন খণ্ড। তবে প্রকাশ করবার জন্য তাঁকে সৎ-চিৎ-আনন্দ বলা হয়। তিনি আছেন তাই সৎ। তিনি জ্ঞান-

স্বরূপ তাই চিৎ। আর এই সৎ-এর জ্ঞান হলেই আনন্দ। সত্য বস্তু জানলেই আনন্দ। তাই সৎ-চিৎ-আনন্দ। আবার তিনিই এই আনন্দ ও নিরানন্দের উর্ধ্বে।

তাই বলি, বই পড়ে কি আর ভগবানকে লাভ করা যায়! শাস্ত্রে বলেছে কতটুকু ?

শাস্ত্র কি রকম, না ছাদে উঠবার সিঁড়ির মত। শাস্ত্র কেবল এই সিঁড়ির ধাপের বর্ণনা দেয় মাত্র। ছাদে উঠলে যা প্রত্যক্ষ করা যায় তার বর্ণনা শাস্ত্রে নেই। কারণ যে একবার ছাদে উঠেছে সে ত নিজেই সমস্ত দেখছে। যা দেখছে তার বর্ণনার দরকার নেই। পথের বর্ণনারই দরকার। শাস্ত্রেও তাই আছে। তাই শাস্ত্র বলে তাঁকে সচ্চিদানন্দ।

প্রকৃতপক্ষে তিনি উহা বটেন, আবার তিনি উহারও উর্ধ্বে। দেব-দেবীর মূর্তি যে দেখা যায়, তা সত্যও বটে আবার মিথ্যাও বটে। সবই সত্য আবার সবই মিথ্যা। এগুলি হলো সিঁড়ির ধাপ। এগুলি জীবের নানা অবস্থা। নানা ভাব। যখন যে অবস্থায় থাকা যায়, সেই অবস্থায় উহা সত্য। পরে ঐ অবস্থার উর্ধ্বে উঠলে ঐ ভাবেরও হয় লয়। সম্পূর্ণরূপে লয় হয় না। যেমন নীচের সিঁড়ি থেকে উপরের সিঁড়িতে উঠলে নীচের সিঁড়ি একেবারে লোপ পায় না। কিন্তু যে উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে তার পক্ষে উহা না থাকারই মত। এসব ভাবও ঐরূপ। আমরা যখন ভাবের রাজ্যে থাকি, তখন সব দেব-দেবী আমাদের কাছে সত্য। আবার এই ভাবের রাজ্য ছেড়ে আমরা যখন সত্যের রাজ্যে যাই, তখন ভাব আমাদের মধ্যে লয় পায়। আমাদের কাছে উহা মিথ্যা হয়ে যায়। আবার আমাদের কাছে মিথ্যা হয় বলে, সকলের কাছেই মিথ্যা নয়। এই অর্থে দেব-দেবী সত্য। তাই ত বলি ব্রহ্ম খণ্ড ও অখণ্ডে যুগপৎ আছেন। খণ্ডও তিনি অখণ্ডও তিনি। খণ্ডতেও তিনি পূর্ণ-ভাবে আছেন আবার অখণ্ডতেও তিনি পূর্ণভাবে আছেন। যেমন

আমার আঙুল স্পর্শ করলেও আমাকে স্পর্শ করা হয়, অথচ আমি আঙুল নই। আমার কাপড় স্পর্শ করলেও আমাকে স্পর্শ করা হলো, অথচ আমি কাপড় নই। আমার অংশ যেমন আমি, আমার সমগ্র আমিও আমি। এক হয়েও তিনি বহু এবং বহু হয়েও তিনি এক। ইহাই তাঁর লীলা। একটি বালুকণাতেও তিনি যেভাবে পূর্ণ, মানুষের মধ্যেও সেইভাবে পূর্ণ আবার অখণ্ডতেও সেইভাবে পূর্ণ। তবে ইতর জন্তু থেকে মানুষের পার্থক্য এই যে মানুষের মধ্যে আছে এক বিশেষ শক্তি। যা দ্বারা সে পারে পূর্ণতা লাভ করতে। মানুষ বলতে আমি বুঝি যে, যার মনের হুঁশ হয়েছে সেই মানুষ। যার মনের হুঁশ হয়নি, যে বিষয়-বাসনায় তন্ময়, তাকে মানুষ বলা যায় না। সে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীও নয়।

আবার বলছেন অবতারবাদের রহস্যের কথা। ভক্তরা তন্ময় হয়ে শুনছেন। কঠিন তত্ত্বকথা কেমন সহজ করে বলছেন মা—ভক্তদের।

'ভগবান মৎস্যরূপে, কূর্মরূপে, বরাহরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এর অর্থ কি? এর অর্থ এই যে মৎস্য, কূর্ম ইত্যাদি জীবজন্তুর মধ্যেও তিনি পূর্ণভাবে আছেন এবং উহাদের মধ্যে নিজেকে প্রকট করে তিনি এই সত্যই প্রচার করেছেন। এই হলো অবতারবাদের রহস্য। তাই বলি খণ্ডতেও তিনি। অখণ্ডতেও তিনি। যুগপৎ উভয়ই তিনি।'

এবারে ভক্ত শ্রীযুত নিশিকান্ত মিত্র প্রশ্ন করছেন—আচ্ছা মা, সাধনে পতন হলে আবার ওঠা যায় কি?

মাও মিষ্টি করে বললেন, পড়া থাকলেই উঠা আছে বাবা। আসল জিনিস ত উঠা-নামার বাইরে। কথা কয়টি বলেই মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। হাস্যের উচ্ছলতায় বিষয়টি রস ও রহস্যে হয়ে উঠলো ভরপুর।

এই নিশিকান্ত মিত্র হলেন সামসিদ্ধির জমিদার। অর্থবান, বড় মানুষ। শ্রীশ্রীমায়ের সংস্পর্শে এসে সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করছেন। তাঁর কর্মজীবনে ও ভাবজগতে মা এনে দিয়েছেন অদ্ভুত

এক পরিবর্তন। মা'র বলারও যেমন বিরাম নেই, কথারও নেই শেষ। মা যে রাজার রাজা। কথারও রাজা। কথা-সম্রাট। কথা-সম্রাজ্ঞীও বটে।।

এবারে মা বলছেন রায়বাহাদুর যোগেশ ঘোষের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে,—'বয়স বেড়েছে ভাল কথা। দীর্ঘজীবন লাভ পুণ্যের ফলে হয়। যত বেশী বেঁচে থাকা যায় তত ভোগ কেটে যায়। মৃত্যুচিন্তা করতে নেই। বরং ভাবতে হয় আমার ভোগ কেটে যাচ্ছে।' তার পর মৃদু হেসে যোগেশবাবুকে দেখিয়ে বলছেন, 'তুমি ওঁকেই তোমার গোপাল মনে করিও। মনে শান্তি পাইবে।'

আবার বলছেন যোগেশবাবুর কন্যা মৃণালিনী দেবীকে, 'সেবা পরমধর্ম মনে করে করবে। স্বামী, পুত্র, পিতা, মাতার সেবা করাই ত মেয়েদের ধর্ম।' নিজের সুখের জন্য ত মেয়েদের জন্ম হয় নি। দেখ না ব্রজাঙ্গনাদের নিজ সুখবাঞ্ছা কিছুই ছিল না। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সুখোদ্দেশে সমুদায় কার্য করতেন। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করতেন। সংসারে শান্তি পেতে হ'লে চাই ত্যাগ আর সেবা।'

রায়বাহাদুর যোগেশ ঘোষের সমস্ত পরিবারই এখন মায়ের পরম ভক্ত। সকলেই মায়ের নামে আত্মহারা। পাগল। পুত্র প্রফুল্ল-বাবু ও চারুবাবুর জীবনেও মা এনে দিয়েছেন ভগবৎ ভাবের উন্মাদনা। মায়ের সংস্পর্শে এসে তাঁদের জীবননদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে অন্য এক ধারায়। তাঁরা এখন মা আনন্দময়ীর উপাসক। সন্তান ভাব। মাতৃ-উপাসক।

এইভাবে লীলাময়ী মা লীলা করছেন ভক্তসনে। ঢাকায়। শাহবাগে। ভক্তের মেলা বসেছে। এক একজন ভক্ত প্রশ্ন করছেন, মাও উত্তর দিচ্ছেন প্রসন্ন স্বরে। ক্লান্তি নেই। নেই অবসাদ। সারাটি অঙ্গে দিব্যকান্তি। উদাস বিহ্বল দৃষ্টি। মা যে আমাদের আনন্দময়ী। আনন্দের আধার।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে এল। ডুবন্ত সূর্যের আলো ফুটে উঠলো

শাহবাগের মাতৃমন্দিরে। ঝির ঝির করে বইতে লাগলো বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাস। আর সেই বাতাসে ছড়ালো ফুলের সুমধুর গন্ধ। শুরু হলো নামগান। কৃষ্ণগুণগান। 'গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।'

কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে আনন্দময়ী মা প্রেমানন্দময়ী শ্রীরাধারাণীর মূর্তি ধারণ করলেন। অভাবনীয় অনির্বচনীয় এক পরিবেশের হলো সৃষ্টি। অমিত সৌভাগ্যবান ঢাকার ভক্তদল মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন মায়ের ভাবময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে।

* * *

'জগৎ ভরাই তো আশ্রম, নূতন করে আশ্রম করিব কি?' ভাইজী আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করায় শ্রীশ্রীমা এই কথা বললেন। প্রত্যুত্তরে ভাইজী বললেন,—'আমরা তো বেশী কিছু চাই না। কেবল এমন একটি স্থান চাই যেখানে আপনার চরণের চারিধারে আমরা সবাই মিলে কীর্তন করতে পারি।'

'যদি এরকম কিছু করিস তবে ঐ যে ভাঙা বাড়িখানি দেখছিস, ঐ স্থানই প্রশস্ত, উহা তোদের পুরানো বাড়ি।' এই কথা বলে মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীমা যে স্থানের ইঙ্গিত করলেন সেখানে ছিল একটি শিব মন্দির। বহু প্রাচীন। ভগ্ন অবস্থায়। এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হলো আশ্রম। এই হলো ঢাকার ভক্তমণ্ডলীর বড় সাধের 'রমনার আশ্রম'।

শ্রীশ্রীমায়ের ভাবের খেলা বিচিত্র। কখন কি করেন, কেন করেন, তা বুঝবার চেষ্টা করা বৃথা। ১৩৩৬ সালের ১৯শে বৈশাখ। ভক্তমণ্ডলীকে নিয়ে মা কীর্তন সমারোহে নূতন আশ্রমে করলেন পদার্পণ। চতুর্দিকে আনন্দের রোল। মাকে ঘিরে আনন্দ। নিত্যানন্দময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর উপস্থিতিতে নব-প্রতিষ্ঠিত রমনা আশ্রমের গৃহাভ্যন্তরে নির্মল আনন্দের ঢেউ বইতে লাগলো। বাউল-

বাবু ফুলের মালায় মাকে সাজালেন। ফুলের মুকুট মস্তকে ধারণ করে শ্রীশ্রীমা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধারণ করলেন। অপরূপ শোভায় হলেন শোভিত। এইভাবে ভক্তবৃন্দসহ শ্রীশ্রীমা মহা আনন্দে মেতে রইলেন। কিন্তু কারো মনে এ-সম্ভাবনার উদয় হয়নি যে, মিলনোৎসবের এত আনন্দ এত শীঘ্রই হবে বিষাদে পরিণত। পরের দিনও কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে ভক্তবৃন্দ কীর্তন করতে লাগলেন। নামগান। কৃষ্ণগুণগান। আর হলো ভাবাবেশ। ভাব-বিহ্বলতা। কীর্তনেরও যেমন নেই বিরাম, তেমনই শ্রীশ্রীমা'র ভাবেরও নেই অন্ত। এক এক সময়ে এক এক ভাবে হতে লাগলেন প্রতিভাত। কখনও দশপ্রহরণধারিণী দশভুজার রূপ। কখনও বা পরমৈশ্বর্যদায়িনী কল্পলতারূপিণী, কমলা কমল-দল-বিহারিণী। কখনও আবার কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী শ্রীশ্রীরাধারাণীর রূপ। মধ্যরাত্রিতে শ্রীশ্রীমা হঠাৎ বললেন, 'তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আজই ঢাকা ছেড়ে যাব। বাধা দিলে শরীর ত্যাগ করেই চলে যাব।'

যেমন ছিলেন সেই অবস্থায়ই এক বস্ত্রে মা আশ্রম ত্যাগ করলেন। প্রথম যে ট্রেন এল তাতেই উঠে অন্তরের ইঙ্গিতে বেরিয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই হলো পূর্ণ। মত্ত বিহঙ্গমের মত আপন খুশির খেলায় বিভোর হয়ে সঙ্কল্পের হাওয়ায় দেশ হতে দেশান্তরে তিনি লঘুপক্ষ বিস্তার করে ভেসে বেড়াতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীমা একদিক দিয়ে যেমন সবার আপন, অপরদিকে আবার কারুরই নন। কিন্তু তবুও মায়ের পায়ে-চলা পথের দুই পাশে জড়ো হয়ে থাকে বন্ধনহীন গ্রন্থিতে বাঁধা নবাগত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণগুলি। একদিন না একদিন তাদের কথা মনে করে বিশ্বের জননী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আসবেন ফিরে। এই নিশ্চিত আশার প্রদীপটি জ্বালা থাকে তাদের মনের শূন্য মন্দিরে।

কুড়ি

৺তারাপীঠ। শ্মশান। মহাশ্মশান।

এই মহাশ্মশানের অভ্যন্তরে মহামুনি বশিষ্ঠের সাধনপীঠ, উপরিভাগে সুবৃহৎ মন্দির।

সর্বসংহারিণী, শ্মশানবিহারিণী, কালী, কালী-তারার মন্দির। ৺তারামায়ের মন্দির।

পরম পবিত্রভূমি। বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্যে, মাধুর্যে ও ঐশ্বর্যে প্রকৃতি নয়নাভিরাম। সাধনার লীলাভূমি। তপস্যার প্রাণকেন্দ্র।

এই পবিত্র শ্মশানভূমিতেই তপস্যাভাস্বর কালীসাধক বামাক্ষ্যাপা আত্মার ঐশ্বর্যলাভ করেছিলেন। এই মহাতীর্থেই তিনি আপন তপঃশক্তিতে অসাধ্যকে করেছিলেন সুসাধ্য।

সেই তপোভূমিতেই আজ এসেছেন 'মা'। শ্রীশ্রীমা। আনন্দময়ী মা।

ব্রহ্মানন্দে উন্মাদিনী শ্রীশ্রীমা আবির্ভূ‌তা হয়েছেন ৺তারাপীঠের মহাশ্মশানে। যেন মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অধিষ্ঠিতা হয়েছেন মন্দিরের বহির্ভাগে, ভক্তের সঙ্গে লীলা করবার মানসে।

অমারাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারের পটভূমিতে তিনি কালিকার বরাভয়দায়িনী স্নেহময়ী মাতৃপ্রকৃতি। আবার তিনিই করালবদনা। নরমালাবিভূষণা। নিমগ্না রক্তনয়না। চণ্ডমুণ্ডমালিনী ভীষণা সংহারমূর্তি।

তিনিই একাধারে প্রজ্ঞা প্রেম রূপ নাম ত্যাগ ও শক্তির একায়ন। তিনিই মূর্তিমতী অবতীর্ণা ভগবতী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।

তারাপীঠের নির্জন স্থানে কয়েক ঘর পাণ্ডার বাস।

ছোট গ্রাম। মেটে ঘর। মেটে পথ। পথের দু'ধারে বনতুলসীর জঙ্গল। সেই জঙ্গল থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে আসে তুলসীর উগ্র গন্ধ। আশেপাশে ছোট ছোট ডোবা।

এই ডোবায় মেয়েরা বাসন মাজে। কাপড় কাচে। আর এই মন্দিরেরই সন্নিকটে 'জীওল-পুকুর', জীবিত পুষ্করিণী। ৺তারাপীঠের জীবিত পুষ্করিণী বিখ্যাত। সাধক বামাক্ষ্যাপার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই জীবিত পুষ্করিণীর ইতিহাস।

শ্রীশ্রীমা পৌষ মাসের শীতের রাত্রিতে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই জীবিত পুষ্করিণীর জলে। ভক্তবৃন্দ আশ্চর্যান্বিত হলেন আর হলেন অভিভূত, মায়ের এই অভাবনীয় ভাবোম্মাদনা দর্শন করে।

মা হাসতে হাসতে বললেন, 'জল ডাকিতেছে, জলের কাছে যাইতেছি, কিছু ফেলিয়া যাইতে নাই, সব নিয়াই জলকে জড়াইয়া ধরিলাম।'

মায়ের আহ্বানে ভক্তবৃন্দও এই অপার মহিমান্বিত মাতৃতীর্থে অবগাহন করে হলেন ধন্য।

সে এক অপরূপ দৃশ্য।

মায়ের স্নেহধারা বর্ষিত হলো ভক্তবৃন্দের উপর। ৺তারাপীঠের গৃহস্থ বধূদের উপর। গ্রামবাসীদের উপর।

শুধুমাত্র মানবজাতি নয়। মায়ের এই স্নেহধারা উৎসারিত হয়েছে জগতের প্রতিটি জীবের জন্য। বনের পশুপক্ষী, বৃক্ষরাজি, স্থাবর জঙ্গম সকলের সঙ্গেই আছে মায়ের অন্তরের যোগ। জগতের সমস্ত মাতৃত্বের একীভূত মূর্তি হলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।

যিনিই মহতো মহীয়ান তিনিই আবার অণোরণীয়ান। যিনিই জগন্মাতা, যাঁর কণামাত্র স্পর্শে জগতের সকল মায়ের মাতৃত্ব, তিনিই এসেছেন সাধারণ মানবী হয়ে। সাধারণ মানবী মায়ের মত আনন্দে হাসছেন, দুঃখে কাঁদছেন, কখনও বকছেন আবার আদরও করছেন কখনও।

৺তারাপীঠের এই পবিত্রভূমিতে সাধক বামাক্ষ্যাপা একদিন যে মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে ধন্য হয়েছিলেন, সেদিন জগন্মাতা দর্শন দিয়েছিলেন শুধুমাত্র ভক্ত বামাক্ষ্যাপাকে। আর আজ সেই পীঠ-

স্থানে বিশ্বজননী স্বয়ং মানবীরূপে অবতীর্ণা হয়ে দর্শনাভিলাষী প্রতিটি মানুষকেই দিচ্ছেন দর্শন।

মর্ত্যের দুর্বিষহ মর্মবেদনায় বিচলিত হয়ে স্বর্গ নেমে এসে ধরণীকে ধরা দিয়ে যেন বলছে, 'দেখ্, ওঠ্, আমি আসিয়াছি।'

দিকে দিকে প্রচারিত হলো বিশ্বজননীর আগমন সংবাদ। দূর দূরান্তর থেকে গ্রামবাসীরা ছুটে এসেছে ভগবতী মা—ঢাকার মাকে দর্শন করবে বলে, আর তাঁর শ্রীচরণকমলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবার অভিলাষে।

৺তারাপীঠ মাতৃ-উৎসবে উঠেছে মেতে। দিকে দিকে সমারোহ। অগণিত লোক। যেন প্রত্যেক দিনই মেলা। মহামহোৎসব। কি সে দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা! শুধু দেখবে। দূর হতে জগজ্জননীর একবার দর্শনলাভ করতে পারলেই ধন্য।

গ্রামের লোকেরা বলাবলি করছে, 'কোনদিন গ্রহণ উপলক্ষেও ৺তারাপীঠে এত ভিড় হয় না। আজ ঢাকার মাকে দেখতেই আমরা সব এসেছি।'

শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে নূতন নূতন দোকান বসেছে। দোকানে ভিড় লেগেই আছে। মাতৃ-উৎসবের মেলার ভিড়।

গ্রামের চাষীরা বলাবলি করছে, 'অনাবৃষ্টির সময় মা আসায় খুব বৃষ্টি হচ্ছে।' তাই মাঠে মাঠে মাকে বেড়াতে দেখে তাদের খুব আনন্দ। মা মাঠে মাঠে যতদূরই যান সেখানেই 'ঢাকার মা'কে দেখবার জন্য হিন্দু মুসলমানের ভিড়। সরল গ্রামবাসীরা সরল মন নিয়ে জগন্মাতাকে দর্শন করে পরমানন্দ অনুভব করছে মনে মনে।

মা বলছেন, 'হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।'

'যাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এই সুদীর্ঘ পথ চলা তাঁহারই তো কৃপা। কেবল ধৈর্যের আশ্রয় গ্রহণীয়। নিরাশ হইতে নাই। যেখানে সেখানে যে ভাবে সে ভাবে কেবল তাঁর দিকেই মনটা রাখা।'

*

'মা! মাগো! তুমি আমাদের ছেড়ে আজই চলে যাবে? তুমি যাবে। মোটর এসেছে। মোটরের শব্দ শুনে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। যেন আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে নিতে অক্রূর এসেছে।' বললো একজন পাণ্ডার স্ত্রী। বলতে বলতে কণ্ঠ তার আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল। দুই গণ্ড বেয়ে ঝরতে লাগলো অশ্রুধারা।

মা মৃদু হেসে বললেন,—আমার জন্য তোমরা এমন করছো কেন? আমি তো তোমাদের মতই সাধারণ মানুষ।

বউটি আবেগভরে বলে উঠলো,—মা, আমরা তারাপীঠের লোক। এ সিদ্ধস্থান। কত সাধু-সন্ন্যাসী আসেন দেখি। আমরা মা লোক চিনি। তোমার মত এমন ভগবতী মা আমরা কখনও দেখি নাই।

মা প্রত্যুত্তরে বললেন,—আমি তো সাধু-সন্ন্যাসী না, তাঁদের সঙ্গে আমার কি কথা!

ভক্ত বউটি জগজ্জননীর ছলনা বুঝতে পেরে বললো,—মা, কেন ছলনা কর? তুমি যে আমাদের ভগবতী মা।

শ্রীশ্রীমা ভক্তের আকুতি দেখে প্রীত হলেন। তার পর নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন বউটিকে। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রাণহরা মা তারাপীঠের বাসিন্দাদের প্রাণ নিয়েছেন হরণ করে। তাই তো আজ মায়ের কলকাতা গমনের সংবাদে সকলেই শোকে মুহ্যমান।

তারাপীঠের ভক্তরা কি এক গভীর বেদনায় বাক্‌শক্তিও যেন ফেলেছে হারিয়ে। সকলেরই মুখ শুষ্ক। অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে তাদের চক্ষুর্দ্বয়। আর তাদের প্রাণের বাণীও যেন গুমরে উঠছে বৃক্ষ-লতা-গুল্মের শাখায় শাখায় পত্রে পত্রে—'হে দেবী, হে ভক্তপ্রাণ-স্বরূপা মূর্তিমতী কৃপা, বিশ্বজননী—তুমি আমাদের ছেড়ে যেয়ো না.........যেও না।'

তারাপীঠের ভক্তবৃন্দকে কাঁদিয়ে, অবশেষে মা আনন্দময়ী রওনা হলেন কলকাতার পথে। আঁকাবাঁকা মেটে রাস্তার ওপর দিয়ে মোটর গাড়ি ছুটলো।

অবশেষে রামপুরহাট এসে মা ভক্তবৃন্দসহ কলকাতার ট্রেনে উঠলেন।

ভোলানাথের উপর মায়ের আদেশ হলো, বৎসরের মধ্যে একদিন তারাপীঠে অবস্থান করবেন।

এই মহান মাতৃতীর্থেই শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ 'তারা সিদ্ধি', 'শিব সিদ্ধি' করেন লাভ।

মধ্যপথে শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ অবতরণ করলেন, বক্রেশ্বর তীর্থ দর্শনমানসে। বক্রেশ্বর তীর্থ পীঠস্থান। মহাশ্মশানের উপর অবস্থিত মন্দির। এখানে দেবী মহিষমর্দিনী। ভৈরব বক্রনাথ।

বক্রনাথের পার্শ্বেই অষ্টাবক্র মুনির মূর্তি। পুরাকালে হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বধ করায় ভগবান নৃসিংহদেবের নখরে অনুভূত হয় অসহনীয় জ্বালা। মহামুনি অষ্টাবক্র গ্রহণ করেন সেই জ্বালা নিজ হাতে। জ্বালা প্রভাবে কষ্ট অনুভব করায় নৃসিংহদেব তাঁকে বললেন, বক্রনাথ মহাদেবকে স্পর্শ করতে। গহ্বর মধ্যে অবতরণ করে অষ্টাবক্র মুনি যে মুহূর্তে মহাদেবকে স্পর্শ করেন সেই মুহূর্তেই সর্বতীর্থের জল এসে তাঁকে করে অভিষিক্ত এবং তিনি হন জ্বালামুক্ত। সেজন্য এখানকার কুণ্ডটির নাম জীবন-কুণ্ড। এখানে অনেক কুণ্ড ও অসংখ্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে সমাকীর্ণ।

এই বক্রনাথকে দর্শন করে শ্রীশ্রীমায়ের মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং দিব্যহাস্যে বিকশিত হয়ে উঠলো। সেই অলৌকিক মূর্তি ও অপার্থিব সৌন্দর্য নয়নগোচর করে মুগ্ধ হলেন ভক্তবৃন্দ।

অবশেষে শ্রীশ্রীমা বক্রনাথ তীর্থ দর্শন সমাপন করে চলে এলেন কলকাতায়। এসে উঠলেন শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয়ের বাসায়। সালকিয়াতে।

মায়ের আর চলার বিরাম নেই। পথের পর পথ চলেছেন। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছর ঘুরে আসে।

বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে আবার ফিরে এলেন এই মহানগরী কলকাতাতে।

সেই আত্মভোলা ভাব। মুখে কৃষ্ণ নাম। চোখে অজস্র বারিধারা।

একুশ

দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণে বহির্গত হলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। বিশ্বজননী বিশ্বকল্যাণে ব্রতী হয়ে ঝটিকাবেগে ছুটে চললেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। কর্মমুখরতার মধ্যে করলেন আত্ম-দান। জগজ্জননী যে তাঁর সন্তানের জন্য দুঃখ দুর্গম সাধনপথই নিলেন বেছে।

কলকাতা থেকে প্রথমে এলেন ওয়ালটেয়ারে। সেখান হতে মাদ্রাজ। মাদ্রাজে সাতদিন অপেক্ষা করে চলে এলেন পরমপবিত্র গোদাবরী তীরে।

পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতী। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। তীরে সুরম্য বন। বিবিধ তরুলতাগুল্মে চারিদিক যেন এক শ্যামল শোভায় হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল। ফল ও ফুলের বিচিত্র সমারোহে, নানাজাতীয় বিহঙ্গের মধুর কলকাকলীতে আরও রমণীয় করে তুলেছে সে নদীতীর। মনে জাগিয়ে তোলে অপূর্ব এক পুলক। এই স্থানের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নগোচর করে একদিন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অপার্থিব উল্লাসে হয়ে উঠেছিলেন উল্লসিত।

আজ শ্রীশ্রীমাও ব্রহ্মানন্দে হয়ে উঠলেন উন্মাদিনী। ভগবৎ আবেশে আত্মহারা হয়ে তিনি ভুলে গেলেন তাঁর লৌকিক পরিচয়।

শ্রীশ্রীমায়ের সেই ভাব-বিহ্বল মূর্তি নয়নগোচর করে ভক্তবৃন্দ নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতে লাগলেন।

অবশেষে চিদাম্বরমে—আকাশ লিঙ্গ; ত্রিচিতে—শ্রীরঙ্গমে—অনন্ত

শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর মূর্তি আর মাত্বরায় মীনাক্ষী দেবীকে দর্শন করে শ্রীশ্রীমা এলেন ভারতখ্যাত প্রাচীন তীর্থভূমি কাঞ্জীভরমে।

কাঞ্চী। কাঞ্চীপুরী। কাঞ্চীপুরম।

সত্যব্রত ক্ষেত্রম্।

আর মহাকবি কালিদাসের সেই 'নগরীষু কাঞ্চী।' সহস্র-মন্দিরময়ী সুবর্ণপুরী। শিল্প-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শনের সনাতন লীলাক্ষেত্র। ভারতের সপ্তনগরীর অন্যতম। দক্ষিণ ভারতের বারাণসী ধাম এই মহিমময়ী কাঞ্চী। এই স্থানেই একদিন তামিল ভাষায় রচিত হয়েছিল শ্রীকন্দপুরাণম্ ও কাঞ্চীপুরাণম্। পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও উল্লেখ আছে এই কাঞ্চীপুরমের। এই কাঞ্চীপুরমেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কৌটিল্য শ্রীচাণক্য।

এক সময়ে শ্রীশঙ্করাচার্য ও বৌদ্ধ ভিক্ষু বোধিধর্ম, দিঙ্‌নাগ, ধর্মপাল প্রমুখ খ্যাতিমান দার্শনিক ও পণ্ডিত এখানে বাস করে ধর্ম ও শিক্ষার প্রসারে করেন মনোনিবেশ।

আর বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরামানুজম এই স্থানেরই বিষ্ণুমন্দিরে বরদানের দেবতা 'বরদ-রাজের' চরণতলে ধ্যানানন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। বৌদ্ধ-জৈন-শৈব আর বৈষ্ণব—চার ধর্মই প্রাধান্যলাভ করেছে এই কাঞ্চীপুরমে।

সেই বহু মনীষার বহু সম্প্রদায়ের বহু সাধুসন্তের চরণপূত প্রাচীন কাঞ্চীপুরমে আজ পদার্পণ করলেন সরলা অবলা 'শাহবাগের সেই বউটি'। 'ঢাকার মা'। 'শাহবাগের মা'। শ্রীশ্রীবিশ্বজননী আনন্দ-ময়ী মা।

মাও হলেন ধ্যানানন্দে বিভোর। ভাবোন্মাদে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। শ্রীরামানুজের ভাব। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব। ভগবৎ আবেশে জগন্মাতার অপরূপ মূর্তি ধারণ করলেন।

মা পরিভ্রমণ করতে লাগলেন-কাঞ্চীপুরমের বিভিন্ন স্থান। ভক্ত-বৃন্দসহ মা এলেন একাম্বরনাথের মন্দিরের সম্মুখে। শ্রীশ্রীমা

আবার ভিন্ন এক ভাবমূর্তি ধারণ করলেন। আনন্দবিহ্বল মূর্তি। মুখে মৃদু মৃদু হাসির ছটা, যেন স্বয়ং নয়নগোচর করছেন শিবপার্বতীর বিবাহ।

এই স্থানেই। এই একাম্বরনাথের মন্দিরের সন্নিকটেই শিব-পার্বতীর দ্বিতীয়বার বিবাহ-অনুষ্ঠান হয়েছিল সম্পন্ন।

শিব যখন বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের কাজে ছিলেন ব্যাপৃত, সেই সময় পার্বতী হঠাৎ চঞ্চল হস্তে শিবের চক্ষুর্দ্বয় রুদ্ধ করে দেন। সেই মুহূর্তেই সমগ্র বিশ্ব তমসার অন্ধকারে হয়ে যায় আচ্ছন্ন। শিব ক্রুদ্ধ হয়ে পার্বতীকে দিলেন অভিশাপ। পার্বতী চলে এলেন মর্ত্যভূমিতে। পৃথিবীতে। এই কাঞ্চীপুরমে। কম্বা নদীর তীরে।

তার পর শুরু হলো তপস্যা। বালির শিবলিঙ্গ গড়ে তপস্যায় মগ্ন হলেন পার্বতী। শিব পার্বতীর তপস্যায় নানাভাবে করলেন বিঘ্ন সৃষ্টি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। অবশেষে শিব তাঁর জটাজাল হতে গঙ্গাকে দিলেন উন্মুক্ত করে পার্বতী-পূজিত বালির শিবলিঙ্গকে ভাসিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। পার্বতী কঠোর তপস্যায় মগ্ন। অচল। অটল। পার্বতীর নিষ্কাম প্রেম ও ভক্তি দর্শন করে প্রীত হলেন শিব। ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন পার্বতীকে নিজ আলয়ে, সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করবার মানসে।

কৈলাসে হরপার্বতীর বিবাহের দিন হলো স্থির। এদিকে শিব-পার্বতীর বিবাহ দেখবার জন্য দেবতা ও সাধু-সন্তের ভিড় লেগে গেল। কৈলাসে স্থান সঙ্কুলান করতে না পেরে শিব অগস্ত্যকে কিছু লোক নিয়ে দক্ষিণে এই কাঞ্চীপুরমে যাওয়ার দিলেন নির্দেশ। তখন অগস্ত্য এই পুণ্য বিবাহোৎসব দেখবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করলেন শিবের নিকট। শিব অগস্ত্যকে আশ্বাস দিলেন এই কাঞ্চীতেই তাঁদের আরো একবার বিবাহ-অনুষ্ঠান হবে সম্পন্ন এবং পরে এই একাম্বর-নাথের মন্দিরের সন্নিকটস্থ আম্রবৃক্ষ তলে শিব-পার্বতীর দ্বিতীয়বার

বিবাহ-অনুষ্ঠান হয় সম্পন্ন। তাই তো এই কাঞ্চীপুরমের আকাশ বাতাস মাটি এত পবিত্র।

শ্রীশ্রীমাও এই পবিত্রভূমি স্পর্শ করে আবার যাত্রা করলেন অন্য তীর্থাভিমুখে।

রামেশ্বর সেতুবন্ধ দর্শন করে মা এসে পৌঁছুলেন কন্যাকুমারিকাতে। স্থানটি নির্জন। অতীব মনোরম। সমুদ্রের তীরেই কুমারী দেবীর মন্দির। দেবীর কুমারী রূপ চন্দন দিয়ে অতি সুন্দরভাবে সাজানো। শিবের বাগদত্তা কন্যাকুমারী। হাতে মালা নিয়ে প্রিয়তমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। তাঁর কোমল মুখমণ্ডল আশার আলোকে আলোকিত। শিব তবুও তাঁর হিমাবাসে নির্গুণের ধ্যানে অবিচল।

কন্যাকুমারীকে দর্শন করে মায়ের ভাবমূর্তিরও হলো পরিবর্তন। মায়ের মুখমণ্ডলে ফুটে উঠলো ব্যাকুলতা। শিবের জন্য পার্বতীর ব্যাকুলতা। শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্রজগোপিনীদের ব্যাকুলতা। শ্রীরাধারাণীর ব্যাকুলতা। অনন্তের পিপাসার ব্যাকুলতা।

প্রেমে ঢল ঢল মুখ। ছল ছল আয়তলোচন। যে দেখে সেই ভক্তিপ্লুত হয়ে প্রণাম করে। অসংখ্য লোক কি এক মধুর উন্মাদনায় ছুটে আসতে লাগলো শ্রীশ্রীমায়ের যাত্রাপথে। শত শত মাথা লুটিয়ে পড়লো শ্রীশ্রীমায়ের চরণকমলে। মুগ্ধ আত্মহারা জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে রটে গেল স্বয়ং কন্যাকুমারী আবির্ভূতা হয়েছেন মন্দির-প্রাঙ্গণে।

ছোট ছোট কুমারী মেয়েরা অতি সহজেই মাকে নিল আপন করে। মায়ের সঙ্গে তাদের ভাষার দিক দিয়ে না হলেও ভাবের দিক দিয়ে পরিচয় হয়ে উঠলো গভীর হতে গভীরতর। ধর্মশালায় এসে মাকে মধ্যস্থানে বসিয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে গান করতে লাগলো তারা। শ্রীশ্রীমাকে ঘিরে আনন্দোৎসবে মেতে উঠলো সকলে। পনেরো দিন অবস্থান করলেন শ্রীশ্রীমা এই কন্যাকুমারীতে। সকলেরই আনন্দ। মহানন্দ। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দময় হয়ে উঠলো আকাশ বাতাস, জগৎসংসার।

তারপর একদিন অকস্মাৎ এই আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ যাত্রা করলেন ত্রিবেন্দ্রামের পথে। ত্রিবেন্দ্রামে এসে পদ্মনাভের মন্দির দর্শন করলেন। অনন্তশয্যায় শায়িত পদ্মনাভ। নারায়ণ। লক্ষ লক্ষ নারায়ণ শিলা দিয়ে তৈরী হয়েছে এই মূর্তি। বিশাল মূর্তি। তিনটি দরজা। প্রথম দরজা দিয়ে মস্তকের অংশ, মধ্য দরজা দিয়ে শরীরের মধ্যভাগ ও তৃতীয় দরজা দিয়ে শ্রীচরণ দর্শন করান হয়। একজন দণ্ডি সন্ন্যাসী এই মন্দিরের পূজক। পূজারী এসে মন্দিরে প্রবেশ করবার পূর্বে অন্য কেউই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন না। রাজাও নয়।

কিন্তু মা যে রাজার রাজা। চিন্ময়ী শক্তি। ভগবান শঙ্করের শিরোবন্দিনী। সুরধুনী। নিত্য বৃন্দাবনের পরমানন্দ। ব্রহ্মলোকের অন্তহীন রসোল্লাস। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। সেই ভাগবতী জ্যোতি ও শক্তিকে নয়নগোচর করে অভিভূত হলেন মন্দির কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত সেই ভাগ্যবান লোকটি। যন্ত্রচালিতের মত মন্দির-দ্বার দিলেন উন্মুক্ত করে।

শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আদিপুরুষ স্থাবর জঙ্গম সকলের স্রষ্টা নারায়ণকে করলেন দর্শন।

এইভাবে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ভক্তবৃন্দসহ পরিভ্রমণ করতে লাগলেন দক্ষিণাপথের সমুদয় তীর্থ, নদী, সুরম্য বনভূমি আর ধর্মনিষ্ঠ সাধুরা যুগ যুগ ধরে যে সব প্রাচীন মন্দিরে সাধন ভজন করে গেছেন তাঁদের স্মৃতি-বিজড়িত সেই সব পুণ্য স্থানগুলিতে।

চার মাস ধরে দক্ষিণাপথের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে সমুদ্রপথে মা এসে পৌঁছুলেন দ্বারকাতে। দ্বারকা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরিক লীলাস্থল। যাঁর আদি লীলা শুরু হয়েছিল বৃন্দাবনে যশোদার অঙ্কে, রাধার কুঞ্জে, তাঁর অন্ত্যলীলার সমাপ্তি ঘটেছিল এই দ্বারকায় সত্যভামা ও রুক্মিণীর বিয়োগ-বিধুর প্রেমাশ্রুসলিলে।

এই সেই দ্বারকা। যে স্থানে সাক্ষাৎ সনাতন ধর্মস্বরূপ পুরাণদেব শ্রীমধুসূদন করেন অবস্থান। গোবিন্দ পরমপবিত্র। পুণ্যের পুণ্য। মঙ্গলের মঙ্গল। তিনি যে স্থানে বিরাজ করেন সেই স্থানই সমস্ত জগৎ। সমস্ত তীর্থ ও পুণ্যায়তন। সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম। তিনিই তীর্থ। তিনিই তপোধন। তিনিই পরম দেবতা। পরমেশ্বর। পরম বিধাতা। সনাতন ও পরমপদ। ত্রিলোকী মধ্যে তিনিই ব্যেয়াত্মা এবং ব্যয়াত্মা। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদন হরি এই দ্বারকাতেই নিত্য বিরাজমান।

এই পরমপবিত্র ভূমিতে আজ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর হলো শুভাগমন। ভক্তবৃন্দসহ দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শন করতে এলেন শ্রীশ্রীমা।

অকস্মাৎ মন্দিরে প্রবেশ করে ঘটির জল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করিয়ে নিজের আঁচল দিয়েই সর্ব অঙ্গ দিলেন মুছিয়ে। সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। সে দৃশ্য নয়নগোচর করে পাণ্ডারাও অভিভূত হলেন। বাধা দেবার অবকাশও পেলেন না। মায়ের মুখে শুধু মৃদু মৃদু হাসি।

শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ সম্মুখে মায়ের হলো ভাবাবেশ। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আবেশ হলো মায়ের দেহে। মনে। শ্রীশ্রীমা তখন চলে গেলেন এ জগৎসংসারের বহু ঊর্ধ্বে, এক পরম শান্তিময় ধামে।

শ্রীমধুসূদনের আবেশে মা ধারণ করলেন এক অলৌকিক মূর্তি। সেই অলৌকিক দিব্যপ্রভান্বিত অঙ্গ, চন্দ্রকরোজ্জ্বল মুখকান্তি, আয়ত প্রশান্ত নেত্রের সুধাবর্ষী দৃষ্টির দিকে চেয়ে এক অনাস্বাদিত অপার্থিব উল্লাসে উল্লসিত হয়ে উঠলেন ভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ।

দ্বারকা থেকে শ্রীশ্রীমা উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে চলে এলেন বিন্ধ্যাচলে। নিজ আশ্রমে। স্বামী অখণ্ডানন্দ (শ্রীযুত শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়) ও স্বামী তুরীয়ানন্দের (শ্রীযুত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়) প্রচেষ্টায় মায়ের এই আশ্রমটি গড়ে ওঠে।

ভক্তবৃন্দ দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন। ঢাকা, কলকাতা ও কাশী হতে এসেছেন ভক্তরা। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে বিন্ধ্যাচল আশ্রম। উত্তর কাশী থেকে তপস্যাভাস্বর স্বামী শঙ্করানন্দ গিরিও এসেছেন। স্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের মরমী ভক্ত।

মহানন্দে—শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে বিন্ধ্যাচল আশ্রমে দশ-প্রহরণধারিণী, বৈরোচনী, শত্রুদগ্ধকারিণী, কর্মফলদাত্রী দেবী দুর্গার পূজা হলো সম্পন্ন।

বিন্ধ্যাচল থেকে মা এলেন কাশীতে। স্বর্ণময়ী কাশীতে। শিব-পুরীতে। তারপর শিবের লীলভূমি থেকে এলেন গয়া ধামে। প্রাচীন স্থান। হিন্দুদের পরম পবিত্রভূমি এই গয়া।

বিষ্ণুভক্ত গয়াসুর কর্তৃক স্থাপিত এই ধাম। তাঁরই নাম অনুসারে এ স্থানের নাম হয়েছে গয়া।

প্রচণ্ড শক্তিশালী গয়াসুর যুদ্ধে দেবতাদের করলেন পরাস্ত। দেবতারা পালিয়ে গেলেন স্বর্গ থেকে। শরণাপন্ন হলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর। দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় শ্রীবিষ্ণু নিজ ভক্ত গয়াসুরের সঙ্গে হলেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত। গয়াসুর যুদ্ধে পরাজিত হলেন এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে পরিণত হলেন পাষাণে। পবিত্র সেই পাষাণের বুকে যুগ-যুগান্তর ধরে উজ্জ্বল হয়ে আছে ভগবান বিষ্ণুর পুণ্য চরণচিহ্ন। গয়াসুরের প্রার্থনায় এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বরে তাই তো এই গয়াধামে পিণ্ডদান করলে পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মার মুক্তি ঘটে, আর পরিতৃপ্ত হয় বিষ্ণুভক্ত গয়াসুরের আত্মা।

ভক্তবৃন্দসহ শ্রীশ্রীমা স্নান করলেন ফল্গু নদীতে। তারপর এলেন বুদ্ধগয়া দর্শনে। বুদ্ধগয়াতে দর্শন করলেন বৌদ্ধ মন্দির। সুন্দর স্থান। নির্জন বাগান। বৃক্ষনিম্নে সামান্য কিছু বিছিয়ে ভক্তবৃন্দসহ মা সমস্ত রাত্রি করলেন অতিক্রান্ত।

পরের দিন প্রশান্ত সকালে রওনা হলেন জামসেদপুরের পথে। জামসেদপুর এসে মা উঠলেন শ্রীযুত যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা

কৃষ্ণবাবুর গৃহে। সেই গৃহেই কীর্তনের বন্দোবস্ত হলো। কৃষ্ণকীর্তন। নামগান। বহু লোক সমাগম হতে লাগলো।

কৃষ্ণ-গুণগানে মায়ের দেহে হলো ভাগবত আবেশ। পরমপুরুষের আবেশ। ভাব-বিহ্বল। ভাবে ঢুলু ঢুলু। সর্বজনবিমোহিনী অসামান্যা রূপ ফুটে উঠলো শ্রীশ্রীমায়ের দেহে। প্রেমে ঢল ঢল দুটি কমল আঁখি, কণ্ঠে বিগলিত কৃষ্ণনামসুধা। ভক্তদের হৃদয় ভরে উঠলো অমেয় পুলকে।

কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত হলো মহিমময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর নাম। জামসেদপুরের বাসিন্দাদের ঘরে ঘরে পূজিতা হলেন শ্রীশ্রীবিশ্বজননী আনন্দময়ী মা। মা পূর্ণ করলেন ভক্ত-মনোবাঞ্ছা।

তারপর অকস্মাৎ জামসেদপুরের এই আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে শ্রীশ্রীমা আবার এসে উপস্থিত হলেন ঢাকায়।

* * *

আনন্দময়ী মা আনন্দের প্রতিমূর্তি। আনন্দদায়িনী। শুষ্ক সন্ন্যাসিনী নন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মত। রসিক সন্ন্যাসিনীও বটে। লীলাময়ী মা ভক্তসনে রহস্যও কম করেন না। বরিশাল জেলার একজন ভক্তিমতী স্ত্রীর প্রার্থনার কথা অনুকরণ করে মা বলছেন গুরুপ্রিয়া দেবীকে, অন্যান্য ভক্তরাও বসে আছেন—

দেখ দিদি! কি বলে শোন্।

চাইড্ডা কতা। আর কিছুই চাই না।

আমার মোকদ্দমাটা জিতাইয়া দাও। মানডা রাখিয়া দাও। দুইডা পয়সা পাওয়াইয়া দাও আর রোগডা সারাইয়া দাও। আর কিছুই চাই না। আপনার কাছে এই চাইড্ডা কতা।

আমি কি বললাম শোন, 'দেখ মাগো, যাঁকে পেলে সব পাওয়া যায় তাঁকে পেতে চেষ্টা কর। তাঁকেই ডাকো। তোমার এইসব কষ্টের কথা আবেদন নিবেদন তাঁকেই জানাও। তিনি পূর্ণ কি না।

সবদিক তিনি পূর্ণ করেন। তিনি যে সর্বদুঃখহারী। সর্বদাই তাঁকে ডাকতে চেষ্টা কর। তাঁরই ধ্যান কর। তাঁর কাছেই প্রার্থনা কর। তাঁকে প্রাণ ঢেলে প্রণাম কর। তিনি মঙ্গলময়। শান্তিময়। প্রাণের প্রাণ। আত্মা।'

আবার বলছেন, 'দিদি চাইড্ডা কতা। কতায় এই আইল যা সত্য।'

ভক্তরা হাসছেন, গুরুপ্রিয়া দেবী হাসতে হাসতে কাগজ কলম নিয়ে কথাগুলি লিখতে লাগলেন, 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করবেন ব'লে।

মা এই সব দেখে আবার হেসে হেসে বরিশালের ভাষায় রহস্য করে বলছেন, 'ও দিদি, এসব লেখছ ক্যান? সব কাটিয়া দাও। ঠিক কতা কইছি। হাসি বুঝিও না। তুমি করছ কি? লেখ ক্যান? কাডিয়া থোও।'

এবারে ভক্তসনে মাও হেসে কুটি কুটি। হাসির কলরোল উত্থিত হলো মাতৃমন্দির হতে। সকলেই বিমল আনন্দ উপভোগ করলেন এই নির্মল রসিকতায়।

মা যে সব ভাবেই সমন্বয়। শুধু তাই নয়, মা সব ভাবেরই পূর্ণমূর্তি। জ্ঞান কর্ম ভক্তি সব ভাবেরই মার মধ্যে পূর্ণ প্রকাশ— কোনটা কম বেশী নয়।

বাইশ

—কাসি ত্বং মহাদেবি?

মহাদেবি, আপনি কে? সশ্রদ্ধ দেবগণ জিজ্ঞাসা করছেন দেবীকে।

—অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী, মত্ত প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ। আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমা হতেই এই প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ উদ্ভুত হয়েছে।

জগতের ঈশ্বরী। ব্রহ্মস্বরূপিণী। জগতের কারণ এই শক্তিকে ঋষিগণ ধ্যান সহযোগে ব্রহ্মের নিত্যসংযুক্তা দেখেছেন। সশক্তিক ব্রহ্মই দেবী দুর্গা। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই জগজ্জননী।

ঢাকায় শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে অধ্যাপকবৃন্দ ও বড় বড় দার্শনিকরা সমবেত হয়ে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বের দেবী-উপনিষদে উক্ত সেই দেবগণের সুরে সুর মিলিয়ে একই প্রশ্ন করছেন শ্রীশ্রীমাকে,—আপনি কে ?

শ্রীশ্রীমা কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলে উঠলেন,—'পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।'

পর মুহূর্তেই শ্রীশ্রীমায়ের মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে হয়ে উঠলো উজ্জ্বল। অপরূপ শোভা ধারণ করলো। প্রশান্ত সরল, দিব্যপ্রভায় বিভাসিত, প্রেমমধুর অথচ বেদনার ভারে মলিন। সেই প্রেমময় সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের কথাই যেন দেয় স্মরণ করিয়ে। উপস্থিত দার্শনিক ও অধ্যাপকবৃন্দের দেহে জেগে উঠলো এক অপূর্ব শিহরণ ! অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হলো যেন অমরার অমৃতধারা।

অভিভূত নেত্রে তাঁরা চেয়ে রইলেন 'শাহবাগের সেই বউটি'র মুখপদ্মের দিকে। তাঁদের হৃদয়বীণার তারেও যেন তখন ঝঙ্কৃত হতে লাগলো, পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ ! নারায়ণ ! নারায়ণ !

অবশেষে তাঁরা অনন্ত লীলাময়ী, অনন্ত ভাবময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর শ্রীমুখ হতে নিঃসৃত অমৃতময় ভাষায় শ্রবণ করলেন মায়ের দীক্ষার আর ভাগবত জীবনের বিস্তারিত ইতিহাস।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রশান্ত নেত্রের পুণ্য বিমল দৃষ্টি ও সারা দেহের সুদিব্য দীপ্তি নয়নগোচর করে অপার্থিব উল্লাসে উল্লসিত হয়ে সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী বিদায় গ্রহণ করলেন শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রম থেকে।

মা আত্মপরিচয় প্রদান করেই ভাবস্থ হলেন। ভাব-সমাধি।

* * *

পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীমায়ের প্রমুখাৎ আত্মপরিচয় বিবরণ প্রসঙ্গে

গুরুপ্রিয়া দেবী বলেছেন, 'নিশিকান্ত ভট্টাচার্য নামে মা'র একজন মামাত ভাই কিছুদিন বাজিতপুরে মা'র কাছেই ছিলেন। এইসব আসনাদি ও অলৌকিক ক্রিয়াদির প্রতি উদাসীনতার জন্য তিনি দোষারোপ করতেন ভোলানাথকে। একদিন তিনি ভৎর্সনা করছিলেন, মা তখন আসন করে নিজের ঘরে বসে ছিলেন। ঐ সময় মা'র ভাবটা ছিল অস্বাভাবিক। মাথায় কাপড় ছিল না। শরীর প্রায় ছিল নগ্ন। আলুলায়িতকুন্তলা। অবগুণ্ঠিতা। ঐ অবস্থায়ই মা নিশিকান্তবাবুর প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তিনি ভীত হয়ে মায়ের সম্মুখ হতে দুই তিন হাত পিছিয়ে গেলেন এবং ভীত জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,—আপনি কে ?

মা'র মুখ হতে নিঃসৃত হলো,—পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণী।

ভোলানাথও জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কে ?

মা'র শ্রীমুখ হতে নিঃসৃত হলো,—মহাদেবী।

নিশিবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনার দীক্ষা হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—রমণীবাবুর দীক্ষা হয়েছে ?

—না। পাঁচ মাস পর ১৫ই অগ্রহায়ণ দীক্ষা হবে। (তিথি নক্ষত্রও মা বললেন।)

প্রত্যুত্তরে নিশিবাবু বললেন,—নক্ষত্রটা বুঝতে পারা গেলো না।

মা বললেন,—জানকীবাবু পুকুরে মাছ ধরছেন। তাঁকে ডেকে আন। তিনি বুঝবেন।

জানকীবাবু নবাব স্টেটে কাজ করতেন। মা'র বাড়ির পার্শ্বেই ছিল তাঁর বাসা। তাঁর স্ত্রীকে মা উষাদিদি বলতেন। খুব ভাব ছিল। জানকীবাবুর ঐ সময় মাছ ধরার কথা নয়। কিন্তু তিনি ছিলেন। তাঁকে ডাকা হলো। তিনি এলেন।

জানকীবাবু বুঝলেন তিথি, নক্ষত্র। তখন জানকীবাবুও প্রশ্ন করলেন, আপনি কে ?

মা'র শ্রীমুখ হতে নিঃসৃত হলো,—পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।

আত্মপরিচয় সম্বন্ধে মা বলছেন, 'আমার তখন শরীরের অবস্থা আসন পাতিয়া বসা। গায়ের কাপড়ও ঠিক ছিল না। আমি জানকীবাবুর সম্মুখে ঘোমটা দিতাম। ভোলানাথ ও বড় ভাইয়ের নিকট কত লজ্জার ভাবে চলিতাম। সে সময় এ সব ভাবই ছিল না। আমি বুঝিতেছি গায়ের কাপড় ঠিক নাই। কিন্তু ঠিক করিয়া দিবার মত লজ্জার ভাবই নাই। আমি পরিষ্কার ভাবে সব বলিতেছি। এই সব কথাবার্তায় সেদিন তারা অফিসেই গেল না। প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত এই সব চলিল।'

প্রশ্ন হলো, মা একবার হলেন নারায়ণী। একবার হলেন নারায়ণ, আবার হলেন মহাদেবী। এর কারণ কি ?

মা বলছেন, 'আত্মীয়দের স্ত্রীভাব, ভগ্নীভাব তাই তাঁদের স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এত। একটা পূজা হচ্ছিল, তাতে মহাদেব, মহাদেবী বলা হলো। এও একটা দিক। মোট কথা মূর্ত, অমূর্ত বলিয়াও কিছু কথা নাই। সব কিছুই পূর্ণকেই বুঝাইতেছে। ঝুলন পূর্ণিমার পর যে সোমবার সেই দিনই এই সব কথা হয়। তাহা কি পূর্ণিমার তিন চার দিন পর তাহা খেয়াল নাই। তাহাদের ভাব অনুযায়ী, বাস্তবিক 'নারায়ণ' শব্দই ঠিক ভাবে বাহির হইয়াছিল। আর মহাদেবী শব্দটা বাহির হওয়ার কারণ এই যে, যখনই যে দেবী বা দেবতার পূজা করা হয় পূজক তখন তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া যায়। আমি তখন পূজা করিতেছিলাম, তাই ঐরূপ শব্দ বাহির হইয়াছে। পূজা করিতেছিলাম অর্থ বাহিরের কোন প্রকার ফুল বেলপাতার পূজা নয়। দীক্ষার পর হইতে সেই ভাবেরই কতকগুলি ক্রিয়া হইয়া যাইত।'

*　　　*　　　*

—মা, তুমি কি ? কেহ বলে তুমি অবতার, কেহ বলে তুমি আবেশ। কেহ বলে তুমি সাধক। সিদ্ধজীব। আমি সত্য সত্যই

জানিতে ইচ্ছা করি তুমি কি? প্রশ্ন করেছেন দয়ানন্দ স্বামী। ভারত-ধর্ম মহামণ্ডলের প্রচারক।

শ্রীশ্রীমা প্রত্যুত্তরে বললেন,—তুমি কি মনে কর বাবাজী? তুমি যা মনে কর আমি তাহাই।

গীতায় ভগবান বলেছেন, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।

যারা যে ভাবেই আমাকে ভজনা করে আমিও তাদের সেই ভাবেই ভজনা করি।

যার চিত্ত যে সংস্কারে রঞ্জিত সে তাঁকে সেই ভাবেই দেখবে। সংস্কারমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সেই ভাবেই দেখা স্বাভাবিক।

শ্রীশ্রীমাও যেন আজ সেই মহাবাণীরই করছেন প্রতিধ্বনি।

মা বলেন, 'অসীমকে পাইতে হইলে প্রথমে সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া চলিতে হয়—পরে অনন্তের আভাসে সীমার বন্ধন খুলিয়া যায়।

তেইশ

"সুরধুনীর তীরে ও কে হরি বলে নেচে যায়"—

সুমিষ্ট কণ্ঠে গান গাইছে—'লতিকা'—ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের কন্যা। নবদ্বীপ ধামে। সুরধুনীর তীরে।

নবদ্বীপ ধাম। প্রেমময়ের লীলাভূমি। প্রেম। ভক্তি। অনুরাগ ও বিশ্বাসের মহান তীর্থভূমি। প্রেম ও ভক্তি সাধনার তপস্যা ক্ষেত্র। যাঁদের তপস্যায় শুধু রসাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন।

এই নবদ্বীপ ধামেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মুরলীধর শ্যামসুন্দরের পায়ের নূপুরশিঞ্জন শুনতে পেয়ে শচীমায়ের স্নেহনীড়, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমকুঞ্জ ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সেই প্রেমময়ের সন্ধানে ছুটে গিয়েছিলেন, প্রেমের লীলাভূমি বৃন্দাবন ধামে।

সেই প্রেমের ঠাকুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণের সিংহাসনে বসিয়ে, সমস্ত ভারতভূমিতে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন প্রেম ও ভক্তির মন্দাকিনী ধারা।

ঈশ্বরীয় প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে সেই প্রেমঘন মূর্তিটি যেন তরঙ্গায়িত হয়ে হেলেদুলে বেড়াচ্ছে আজও এই নবদ্বীপ ধামে। আজও নবদ্বীপের বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে সেই প্রেমময় ভগবানের শ্রীঅঙ্গের পুণ্যমধুর সৌরভ।

সেই পুণ্যময় ভূমিতে, সুরধুনীর তীরে শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ বসে প্রেমের ঠাকুরকে হৃদয়ে স্থাপন করে ভাবে বিভোর হয়ে নামগান শুনছেন। পূর্বেও মা কয়েকবার এসেছেন নবদ্বীপে। আবার এলেন। নবদ্বীপ ধামের আকর্ষণী শক্তি আছে। নবদ্বীপ ধামের আকর্ষণ নয়। পরমপুরুষের আকর্ষণ। দেবতার হাতছানি। লীলাময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেমের আহ্বান।

এই নবদ্বীপ ধামেই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিষ্যা চিরকুমারী শ্রীশ্রীগৌরী মা'র সঙ্গে হলেন পরিচিত। গৌরী মা'র কাছে বসে শ্রীশ্রীমা অনেক সময় ধরে হাস্য পরিহাস করলেন। উভয়েই উভয়কে পেয়ে বিমল আনন্দ উপভোগ করলেন মনে মনে। তার পর লীলা করলেন নির্মলা মা ও বিমলা মা'র সঙ্গে। সেখান থেকে মা এলেন রাধেশ্যামের মন্দির দর্শনে। এইভাবে নবদ্বীপ ধামের বিভিন্ন মন্দিরাদি ও প্রাচীন স্থান সকল দর্শন করে, সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন ললিতা সখীর কীর্তনে। শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দ-সহ অবস্থান করলেন নাটমন্দিরে। মায়ের ইচ্ছায় মধ্যরাত্রিতে ললিতা সখী শোনালেন কীর্তন। কৃষ্ণকীর্তন। নামগান।

কৃষ্ণ গুণগানে শ্রীশ্রীমা অন্তরে অন্তরে পরম প্রেমস্বরূপ ভাবঘনতনু মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের জন্য হয়ে উঠলেন ব্যাকুল। ভাবাবেশে হলেন বিভোর। ভাব-সমাধি। সেই যমুনাপুলিনবিহারী মোহন মুরলীধর শ্যামসুন্দর বসলেন এসে তাঁর সমগ্র হৃদয় জুড়ে। তিনি উপভোগ

করতে লাগলেন প্রেমের ঠাকুর শ্যামসুন্দরের দ্বাপরিক লীলার রস।

অবশেষে অনন্তলীলাময়ী শ্রীশ্রীবিশ্বজননী আনন্দময়ী মা নবদ্বীপ ধামের লীলা সাঙ্গ করে আবার ফিরে এলেন কলকাতায়।

চব্বিশ

ইনি কে?

চরণযুগল অলক্তকরাগে রঞ্জিত। হস্তদ্বয় শঙ্খ ও সুবর্ণবলয়ে শোভিত। ললাটে সিন্দূর-বিন্দু। কণ্ঠে সুবাসিত পুষ্পমাল্য। সর্বালঙ্কারভূষিতা। অপূর্ব লাবণ্যময়ী।

এ কি দৃষ্টিবিভ্রম,—না স্বপ্ন? বলছেন শ্যামদাস বাবাজী। হরিদাস ঠাকুরের মঠের বাবাজী। শ্রীক্ষেত্র। পুরীধামে।

ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে তিনি দেখছেন, আনন্দরূপিণী মা আনন্দময়ীকে। সর্বজ্ঞানময়ী ভক্তপ্রাণরূপা মূর্তিমতী কৃপা জগজ্জননী শ্রীশ্রীমাকে।

দৃষ্টিবিভ্রমও নয়। স্বপ্নও নয়। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর প্রত্যক্ষ-মূর্তি বাবাজীর কুটিরে। কিন্তু কিছু সময় মাত্র। দর্শনাভিলাষীকে হঠাৎ দর্শন দিয়ে মা হলেন অন্তর্ধান।

শ্যামদাস বাবাজী পরম বৈষ্ণব। পুরীধামে আছেন প্রায় বিশ বৎসর। বয়স ৮০ বৎসর। বাতে পঙ্গু। কিন্তু মায়ের নামে পাগল। হঠাৎ কেন জানি শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। মাতৃহারা শিশুর মাকে ফিরে পাওয়ার আকুলতা। আকুল হয়ে মাকে ডাকছেন, 'মা-মাগো! কৃপাসিন্ধু মা! কৃপা করো! দেখা দাও! দেখা দাও!' এমন কি এই পঙ্গু অবস্থায়ও দেরাদুন গিয়ে দর্শন করতে প্রস্তুত। ভক্ত শ্যামদাস বাবাজীর তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ভক্তপ্রাণরূপা

জগজ্জননী আনন্দময়ী মা স্বয়ং পুরীধামে বাবাজী কুটিরে এসে দর্শন দিলেন বাবাজীকে।

পরম বৈষ্ণব সিদ্ধপুরুষ শ্যামদাস বাবাজী, ত্রিভুবন আলো করা মা আনন্দময়ীকে নয়নগোচর করে বিস্ময়ে বিহ্বল হলেন। আর আনন্দে হলেন আত্মহারা!

পরে শ্যামদাস বাবাজী বলেন, 'মা আনন্দময়ী এই ঘরে বসিয়াই আমাকে দর্শন দিয়া গিয়াছেন। কয়েক মিনিট এখানে ছিলেন। আমার কি তখন জ্ঞান ছিল? মা কয়েক মিনিট থাকিয়াই চলিয়া গেলেন।'

বিশ্বরূপে আলো করা মা আমার বিশ্বম্ভরা ত্রিভুবন আলো করে আছেন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলই মহামায়ার অনন্তরূপ। বিদ্যা আর অবিদ্যা মায়েরই রূপ। মাগো, তুমিই মাতৃরূপে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিরাজ করছো।'

"বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ"—

পঁচিশ

'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।

ব্রহ্মই সকল প্রকল্প ও ভাবের আদি ও অনন্ত। একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই।

তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং।'

"দেখ আমরা কিন্তু একের মধ্যেই আছি। এক পা এক পা করিয়া হাঁটিতে হয়, এক গ্রাস এক গ্রাস করিয়া খাইতে হয়, এক একটা করিয়া অক্ষর লিখিতে হয়।"

শ্রীশ্রীমা বেদান্তের বাণী সরলভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন ভক্তবৃন্দকে। দেরাদুনে। মনোহর মন্দিরে।

মনোহরলালের একটি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, অপর মন্দিরটিতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। মা আজকাল এই মন্দিরটিতেই বেশী থাকেন। দেরাদুনে এখন মায়ের ভক্তও অগণিত। 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী' নাম বাঁধ-ভাঙা স্রোতের গতিতে সমগ্র উত্তর ভারতকে করে তুলেছে প্লাবিত। মায়ের জন্য লোকের আকুলতাও দিনে দিনে হচ্ছে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক এখন মায়ের কাছে যাতায়াত করেন এবং মাকে করেন দেবীজ্ঞানে ভক্তি। মায়েরও স্নেহধারা হয় বর্ষিত সকল ভক্ত-সন্তানের উপর। মা কারো নাম রেখেছেন গোপালজী, আবার কারো নাম বালগোবিন্দ, লছমীরাণী, মীরা ও কৌশল্যা।

কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকেরা মাকে মালা দিয়ে সাজিয়েছে। মা অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন আর অমৃতময় ভাষায় কথা বলছেন। ভক্ত ও ভগবানের অপূর্ব লীলা চলছে মনোহর মন্দিরে।

'মা আজকাল কোন গৃহস্থের বাড়ি যান না। ধর্মশালায় ও মন্দিরেই থাকেন। কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে বসছেন না। মুক্ত বিহঙ্গমের মত ধর্মাকাশে বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন।

মায়ের বেশভূষারও হয়েছে অনেক পরিবর্তন। পরিধানে সরু চুলপেড়ে ধুতি। গায়ে সেমিজ নাই। ফতুয়ার মত জামা ব্যবহার করেন। মাথায় কাপড় দেন না। চুল একটু বড় হয়ে কাঁধে পড়েছে। পার্বত্য পথে পা ফেটে যায় বলে ভক্তরা জুতো পরিয়েছে। গায়ের চাদর অনেকটা পুরুষের মত করে দেন। দেখলে যুবক ব্রহ্মচারী বলে ভ্রম হয়। সঙ্গে জিনিসপত্র বিশেষ রাখেন না। সামান্য ঘটি, কম্বল ও দু-একখানি কাপড় মাত্র।

ভক্তপ্রবর জ্যোতিষচন্দ্রেরও সন্ন্যাসীর বেশ। পরিধানে আট-হাতি কাপড়। জামা, জুতো ব্যবহার করেন না। কম্বল ও চাদর দিয়েই শরীর রক্ষা করেন।

জ্যোতিষচন্দ্রের সন্তানভাব। বাৎসল্যরস। বাৎসল্য-প্রেমের অমিয়-অভিষেক ধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে তাঁর হৃদয়সিংহাসন। 'মা' 'মা' বলে ডাকেন জগজ্জননী আনন্দময়ী মাকে। মায়ের চরণে জানান তাঁর অন্তরের আকুতি। ভক্তিপ্লুত নিষ্কলুষ জীবনযাপনের ঐকান্তিক প্রার্থনা। কৃপাময়ী মাও ভক্তের মনোবাঞ্ছা করেন পূর্ণ। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাবর্ষণের ফলে জ্যোতিষচন্দ্রের তৃষিত মরুবক্ষে ছুটে যায় যেন মন্দাকিনীর সুশীতল ধারা। তাঁর বুভুক্ষু অন্তর মায়ের সংস্পর্শ লাভ করে পরম সান্ত্বনা লাভ করে। এ যেন যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত সাধনার এক অমৃতময় ফললাভ।

উত্তর ভারতের ভক্তরা জ্যোতিষচন্দ্রকে মায়ের ধর্মপুত্র জ্ঞানে 'ভাইজী' বলে সম্বোধন করেন। তাঁরা মাকে যেমন ভক্তি করেন তেমনই ভালবাসেন ভাইজীকে।

* * *

১৩৪০ সন। বৈশাখ মাস। শ্রীশ্রীমা আবার বহির্গত হলেন তীর্থ পর্যটনে। ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের পদযাত্রা শুরু হলো উত্তর কাশীর পথে।

দেরাদুনের ভক্তবৃন্দ অশ্রুসিক্ত নেত্রে শ্রীশ্রীমায়ের পশ্চাৎ অনুসরণ করলেন। তাঁরা কোনক্রমেই ছাড়তে পারছেন না মাকে। মা যেন সকলের প্রাণ নিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গে করে—তাই তার টানে টানে ভক্তবৃন্দও এগিয়ে চলেছেন আকুল অন্তরে। কতকটা পথ অগ্রসর হয়ে মা ভক্তবৃন্দকে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। আর পেছনে না তাকিয়ে সম্মুখের পথে অগ্রসর হলেন শ্রীশ্রীমা। ভক্তবৃন্দ অনিমেষ নেত্রে চেয়ে থাকলেন মায়ের দিকে, যতক্ষণ তাঁকে যায় দেখা।

মুসৌরী থেকে উত্তর কাশী ৬০।৬৫ মাইল। দুর্গম পার্বত্য পথ। মা চলেছেন একমনে। ব্রহ্মচারীর বেশ। হাতে দণ্ড। মুখে কৃষ্ণনাম।

পেছনে চলেছেন ভক্তপ্রবর জ্যোতিষচন্দ্র। সন্ন্যাসীর বেশে। শ্রীশ্রীমায়ের সমগতিতে। কেউ যে পেছনে আছে এ জ্ঞানও যেন মা'র নেই। এইভাবে প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে মা একদিনে অতিক্রম করলেন ২৫ মাইল পথ।

কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর হয়ে মা পথ চলেছেন। ক্রমে ক্রমে চারিদিকের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যও মায়ের দৃষ্টির সম্মুখ হতে হলো অপসারিত। চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সজল-জলদাঙ্গ মুরলীধর শ্যামসুন্দরের জীবন্তমূর্তি। অপার্থিব উল্লাসে উল্লসিত হয়ে 'মা' অনির্বচনীয় এক মূর্তি ধারণ করলেন। মায়ের সেই ভাবঘন মূর্তি নয়নগোচর করবার জন্য ছুটে এল পথিপার্শ্বস্থ জনপদের লোকেরা—পুরুষ-নারী-নির্বিশেষে।

অবশেষে নয়ন-প্রাণ-হরা মা আনন্দময়ী এসে পৌঁছুলেন উত্তর কাশীতে। মুগ্ধ আত্মহারা জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে রটে গেল দেবী ভগবতী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়েছেন, কে দেখবে ছুটে এসো। সাধু-সন্ন্যাসীদেরও কর্ণগোচর হলো জগজ্জননীর আগমন সংবাদ। কিন্তু স্ত্রীলোক বলে প্রথমে তাঁরা কেহই এলেন না মাকে দর্শন করতে। ক্রমে ক্রমে মায়ের সান্নিধ্যে এসে মহামায়ার মহাশক্তির লীলাবিলাস, অলৌকিক বিভূতি ও সৌম্য মধুর মূর্তি নয়নগোচর করে অভিভূত হলেন তাঁরা। ভাগবতী শক্তির মূর্তপ্রকাশ শ্রীশ্রীমায়ের শান্তমধুর ভাবের আনন্দে নির্জন গিরিকন্দরে তপস্যারত সাধুদের প্রাণেও সৃষ্টি হলো ভাবান্তর। যেন এক বিরাট সত্তার স্পন্দন সমুদ্রের অন্তহীন বিপুল কলোচ্ছ্বাসের মতো তপস্বীর হৃদয়কেও করে ফেললো আচ্ছন্ন। অকস্মাৎ দলে দলে সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে ভিড় করলেন মায়ের আশ্রমে। মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করবেন আর মায়ের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতময় ভাষায় শ্রবণ করবেন সাধনার বিষয়।

কেমন করে কি ভাবে এই ভাবান্তরের স্পন্দন লাগলো সাধু-সন্ন্যাসীদের অন্তরে অন্তরে এ প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত।

মা বলেন, 'ভগবান আসবেন, ভগবানকে পাবো এ ধরনের প্রশ্নই ওঠে না। ভগবান তো রয়েছেনই আমার মধ্যে, আমি তাঁকে পেয়েছি, আমিই তো তিনি,—এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও।'

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ, ব্রহ্মচারী কমলাকান্তসহ বদ্রী-নারায়ণ, কেদারনাথ, যমুনোত্রী হয়ে উত্তর কাশীতে এসে উপস্থিত হলেন। মায়ের সঙ্গে পূর্বেই এরূপ কথা ছিল। উত্তর কাশী থেকে মা আবার ফিরে এলেন দেরাদুনে। তারপর আবার শ্রীশ্রীমায়ের যাত্রা হলো শুরু তীর্থ হতে তীর্থান্তরে। হরিদ্বার, হৃষীকেশ ও লছমনঝোলার বিভিন্ন স্থানে।

* * *

১৩৪০ সন। ভাদ্র মাস। জন্মাষ্টমী তিথি। মনোহর মন্দিরে উৎসব। মহামহোৎসব। যজ্ঞেরও হয়েছে ব্যবস্থা। দুই মন্দিরের মধ্যস্থানে যেখানে মা শুতেন, সেই স্থানের দুই-চারিখানি পাথর উঠিয়ে কুণ্ড করা হয়েছে। ঐ কুণ্ডেই যজ্ঞ হলো শুরু। অভাবনীয় একটি ঘটনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে ঐ যজ্ঞকুণ্ডের স্থানটিকে ঘিরে।

শ্রীশ্রীমা একদিন বারান্দায় শুয়ে আছেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট ভাইজী। অকস্মাৎ একটি কৃষ্ণবর্ণ বিষধর সর্প এসে উপস্থিত হলো ঠিক মায়েরই সম্মুখে। ভাইজী চমকে সরে গেলেন। কিন্তু মায়ের ভাবের হলো না কোনও পরিবর্তন। স্থিরদৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা দেখতে লাগলেন সেই কৃষ্ণবর্ণ সর্পটিকে। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্ত। অকস্মাৎ সর্পটিও হলো অন্তর্ধান। পরমুহূর্তেই ভাইজী ব্যস্ত হয়ে সর্পটিকে অনুসন্ধান করতে হলেন উদ্যত। শ্রীশ্রীমা ভাইজীকে নিষেধ করলেন সর্পটির বৃথা অনুসন্ধান করতে। কৃষ্ণবর্ণ সর্পটি যে স্থানটিতে অবস্থান করছিল, সেই স্থানটিতেই মায়ের নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হলো যজ্ঞস্থান। যজ্ঞকুণ্ড।

রহস্যময়ী মা আনন্দময়ীই জানেন এর ভিতরকার রহস্য।

ছাব্বিশ

'তুমি অখণ্ডভাবে সংসার করিয়া আসিয়াছ, এখনও এই কাজ অখণ্ডভাবেই হউক।'

শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদ করলেন শ্রীযুত শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়কে। কংখলে। মঙ্গলানন্দগিরির আশ্রমে।

শ্রীশ্রীবিশ্বজননী আনন্দময়ী মায়ের নির্দেশে ১৩৪০ সনের চৈত্র-সংক্রান্তিতে শ্রীযুত শশাঙ্কমোহন নিলেন সন্ন্যাসমন্ত্র। গুরু হলেন মঙ্গলানন্দগিরি। সন্ন্যাস নিলেই নামের সঙ্গে আনন্দ যোগ করা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের পূর্বেই দেওয়া নাম অনুসারে তাঁর সন্ন্যাস-নাম হলো অখণ্ডানন্দগিরি।

ভোরের বেলা অখণ্ডানন্দগিরি সন্ন্যাসমন্ত্র নিয়ে সন্ন্যাসীর বেশ প'রে এসে মায়ের চরণে লুটিয়ে প্রণাম করলে, যোগিজনরঞ্জিনী ভক্তপ্রাণরূপা বিশ্বজননী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা ভক্তকে করলেন আশীর্বাদ। আর গুরু সম্বন্ধে সান্ত্বনা দিয়েবললেন অখণ্ডানন্দজীকে। 'সবই তো এক। এক ছাড়া দুই কোথায়? আর সন্ন্যাসী গুরুর সঙ্গে গুরু-শিষ্যের কোন বন্ধন বা সম্বন্ধ হয় না। কাজেই অপর গুরু হইতেছে ইহা মনে করিও না। তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ। সন্ন্যাসী হওয়া খুব ভাগ্যের কথা, আনন্দের কথা। সর্বত্যাগ, সন্ন্যাস মানে—সর্বনাশ। নাশ ভাবও যে নাশ হইয়া যায়।'

মঙ্গলানন্দগিরি সিদ্ধপুরুষ। বয়স ৮০ বৎসর। চিরকুমার। পূর্বাশ্রমের বাড়ি ছিল মথুরায়। প্রায় ৪০ বৎসর কংখলে এই আশ্রমে আছেন। তাঁর গুরুর আশ্রম। শ্রীশ্রীবিশ্বজননী আনন্দময়ী মা ভক্তবৃন্দসহ হরিদ্বার হতে এসে উঠলেন মঙ্গলানন্দগিরির আশ্রমে। শ্রীযুত শশাঙ্কমোহনকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্য।

ভক্ত শ্রীযুক্তা মনোরমা দত্তও সন্ন্যাসমন্ত্র নিলেন মঙ্গলানন্দগিরি মহারাজের নিকট। শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছায় মনোরমা দেবীর নাম হলো কৃষ্ণপ্রিয়া। আর আদরিণী দেবীর নাম মা পূর্বেই রেখেছেন গুরুপ্রিয়া।

শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে অখণ্ডানন্দগিরি, গুরুপ্রিয়া দেবী, বিরাজ-মোহিনী ও স্বামী শঙ্করানন্দ বদ্রীনারায়ণের পথে করলেন যাত্রা।

শ্রীশ্রীমা ভাইজীসহ যাত্রা করলেন মুসৌরীর পথে। মুসৌরীতে শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ অসুস্থ। মা নিজ হস্তে সেবা করে তাঁকে করে তুললেন সুস্থ।

ফুলের সৌরভে অলি যেমন ছুটে আসে, দিগ্-দিগন্ত থেকে মায়ের আকর্ষণে তেমনি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে এল ভক্তরা মুসৌরীতে। শুরু হলো নামগান। নাম-তরঙ্গে ভাসতে লাগলো পাহাড়ের রাণী ছোট্ট মুসৌরী শহর।

কাশী থেকে সপরিবারে এলেন পরমভক্ত নির্মলবাবু (শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। তিনি থিয়সফিকেল সোসাইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গম্ভীর ও দৃঢ়প্রকৃতির মানুষ ঐ নির্মলবাবু। একমাত্র জামাতা ও জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোষের মৃত্যুতেও তাঁর চোখে একবিন্দু অশ্রুও কেহ দেখে নাই। সেই মানুষ মায়ের সংস্পর্শে এসে ভাব-বিহ্বলতায় হয়ে উঠলেন উন্মত্ত। কাশীতে একদিন ভাবে বিহ্বল হয়ে নৃত্য করতে করতে শ্রীশ্রীমাকে করলেন প্রদক্ষিণ। দ্বিতীয়বার এই ভাব-বিহ্বলতা হয় টপকেশ্বরে। মাতৃদেবীর সন্নিধানে।

নির্মলবাবু বলেন, 'মা আমার ভিতরের নর্দমা ভাঙিয়া দিয়াছেন।' প্রকৃতই মায়ের নামে নির্মলবাবুর দুই আয়তনেত্র দিয়ে ঝরে পড়ে অজস্র অশ্রুধারা।

মুসৌরীতে এসেও মা মা নামে মুখরিত ক'রে তুললেন মাতৃ-মন্দির। ভাবোন্মাদনায় বিভোর। সে এক অভাবনীয়, অস্বাভাবিক অবস্থা। মাতৃময় হয়ে উঠলো নির্মলবাবুর দেহ-মন-আত্মা।

মাতৃনামে বিভোর হয়ে অকস্মাৎ ভক্তপ্রবর নির্মলবাবু এই মুসৌরী শহরেই স্নেহময়ী জননীর পদতলে দেহলীলা করলেন সম্বরণ।

শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছায় কংখলে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পারলৌকিক কার্য হলো সম্পন্ন।

মা বলেন,—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে থাকে। মঙ্গলময় সময়মত সব করেন। যা নিত্য সত্য সেই দিকেই সকলের যাওয়া উচিত। হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।

* * *

সেই অমৃতের দিকে যাত্রা করিতেই হইবে, শত শত বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া, সেই পুরুষকারের জাগরণ প্রয়োজন।

সাতাশ

চোখের সামনে আলোয় আলোময় করে উপবিষ্ট ইনি কে? নয়ন-ভুলানো! পরিধানে রক্তবস্ত্র। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। ছলছল আয়তলোচনা, ভুবনমোহিনী মূর্তি।

বলছেন কমলা নেহরু। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর স্ত্রী শ্রীমতী কমলা নেহরু।

অকস্মাৎ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর এই অভাবনীয় মূর্তি নয়নগোচর করে দুটি পরিপূর্ণ চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল তাঁর অশ্রুতে। আনন্দের ঢেউ প্রবাহিত হয়ে চললো তাঁর অন্তরে-অন্তরে।

মায়ের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন শ্রীমতী নেহরু। দেরাদুনের মনোহর মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের সংস্পর্শে এসে মায়ের অনুরক্ত হয়ে পড়েন। মায়ের নির্দেশে অম্বিকা মন্দিরে যজ্ঞও করেছিলেন। তিনি এখন মায়ের প্রধানা ভক্ত।

তাই তো ভক্তপ্রাণবাঞ্ছা জগজ্জননী ভক্তের ব্যাকুলতায় অধীর হয়ে ভক্তকে দিলেন দর্শন। পরমুহূর্তেই শ্রীমতী নেহরু পত্র

লিখলেন শ্রীশ্রীমায়ের পার্ষদ ভক্তপ্রবর জ্যোতিষচন্দ্রকে—'ভাইজী, আপনি আমাকে মা'র খবর সর্বদা দেন না কিন্তু আমার প্রাণটা সর্বদাই মা'র সঙ্গ পাইবার জন্য ব্যস্ত থাকে। আমি মাকে এখান হতেও মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই। কয়েকদিন হয় দেখিতেছি, মা একখানা লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া বসিয়া আছেন।'

অবশেষে যখন জানতে পারলেন আনন্দময়ী মা মুসৌরীতে এসেছেন তখন শ্রীমতী কমলা নেহরুও ছুটে এলেন মুসৌরীতে মাকে দর্শন করতে। ভক্ত ও ভগবানের চললো অপূর্ব লীলা। শ্রীশ্রীমাকে দর্শনমাত্রই তাঁর অন্তরে জেগে উঠলো প্রেমের শিহরণ। তাঁর পুণ্যস্পর্শ পেয়ে কৃতার্থতার আনন্দে বলে উঠলেন—'মাতাজী, কন্যার সঙ্গে আর ছলনা কেন? জানি না আজ কোন্ শুভক্ষণে হয়েছিল আমার প্রভাত। জানি না আবার কোন্ পুণ্যলগ্নে পাবো তোমার দেহের পুণ্যস্পর্শ।'

ভক্তের কাছে ধরা পড়ে মধুর হাসি হাসলেন শ্রীশ্রীমা।

শ্রীমতী কমলা নেহরু মুসৌরীতে মায়ের নিকট এক রাত্রি অবস্থান করে বিদায় নিলেন। মায়ের সঙ্গে এই হলো তাঁর শেষ সাক্ষাৎ। ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাস।

* * *

১৩৪২ সন। আষাঢ় মাস। উত্তর কাশীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 'আনন্দময়ী মা' ভক্তবৃন্দসহ চলেছেন উত্তর কাশী অভিমুখে। ঢাকা, কলকাতা, কাশী ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছেন ভক্তরা। ডাণ্ডি, কাণ্ডি, খচ্চরও নেওয়া হয়েছে সঙ্গে। মুসৌরী থেকে এই বাহিনীসহ পার্বত্যপথে শ্রীশ্রীমায়ের যাত্রা হলো শুরু। মা কখনও চলেছেন ডাণ্ডিতে, আবার কখনও পদব্রজে। মা কিছুদূর অগ্রসর হয়েই আবার অপেক্ষা করেন সকলের জন্য। পিছনের সকলে এসে মিলিত হলে আবার যাত্রা হয় শুরু। জগজ্জননীর সঙ্গলাভে ভক্তবৃন্দ দুর্গম পার্বত্যপথের

পথকষ্টও ভুলেছেন। মাতৃআনন্দে বিভোর হয়ে কীর্তন করতে করতে চলেছেন সকলে।

এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। পাহাড়ের মাথায় জমেছে ধোঁয়াচ্ছন্ন জলভরা মেঘ। তারই ছায়া এসে পড়েছে সবুজ পাদদেশে। বর্ষাকালের হিমালয় পর্বতকে দেখে মনে হয় যেন মহা মহা ঋষির গড়া এক-একটি বিরাট বিরাট মন্দির।

আর সেই দাড়িওয়ালা, শুভ্রকেশ মহাঋষিরা বড় বড় চোখে আনন্দচঞ্চল শিশুর প্রসন্নতা নিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছেন পৃথিবীর শোভবর্ধন করবার জন্যে। তাঁরা দু'হাতে বিচিত্র বর্ণের হীরা-মুক্তা ছড়াচ্ছেন আর পাহাড়ের মাথায় পরিয়ে দিচ্ছেন স্তরে স্তরে রুপোর পুরু আবরণ। ঢালু উপত্যকাগুলিকে ঢেকে রেখেছে নানা বৃক্ষের জীবন্ত বসন। তাঁদের করস্পর্শে ধরিত্রীর এ অঞ্চল এক অলৌকিক সৌন্দর্য ধারণ করেছে।

অবশেষে ছয়দিন ক্রমাগত পথ চলার পর শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ভক্তবৃন্দসহ এসে পৌঁছলেন উত্তর কাশীতে।

উত্তর কাশী। পরম পবিত্র স্থান। মহান তীর্থক্ষেত্র। যুগ-যুগান্তর ধরে সাধু-ভক্তগণের কাঞ্চনতুল্য সমুজ্জ্বল অমূল্য হৃদয়ের ভাবরাশি স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত ও ঘনীভূত হয়ে আছে এই পুণ্য-ভূমিতে। এই পুণ্যভূমির উপর দিয়েই শিব-সলিল-শালিনী শীতল-জল-বাহিনী গঙ্গা কলকল রবে প্রবাহিতা।

আনন্দরূপিণী মা আনন্দময়ীর আগমন-সংবাদ প্রচারিত হলো দিকে দিকে। মাতৃদেবীর দর্শন-মানসে ছুটে এল সকলে। কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সাধু-সন্ন্যাসীরা দলে দলে। জগজ্জনীর রূপ দর্শন করে সম্মোহিত হয়ে গেল সকলে, অন্তর তাদের নেচে উঠলো যেন কি এক অজানা আনন্দে। সমস্বরে সকলে বলে উঠলো—'মা আনন্দময়ীর জয়'।

সমারোহের সঙ্গে মন্দির প্রতিষ্ঠার কার্য সম্পন্ন করলেন

শ্রীশ্রীবিশ্বজননী আনন্দময়ী মা। কালী, শিবলিঙ্গ, লক্ষ্মী, নারায়ণ, গণেশ মূর্তি প্রতিষ্ঠা হলো শিবপুরী উত্তর কাশীতে। এই উপলক্ষে সাধুদের দেওয়া হলো ভাণ্ডারা। শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ সব কিছুই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলেন। তিনি কিছুদিন পূর্বেই এখানে এসেছিলেন এবং দেবালয় প্রতিষ্ঠার কার্য সম্পন্ন হয়ে গেলে গঙ্গোত্রীর পথে যাত্রা করলেন।

দেবালয় প্রতিষ্ঠার পর আরও কিছুদিন শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ অবস্থান করলেন উত্তর কাশীতে। শিবের লীলাস্থলে। শিব লীলা করেছিলেন পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে এই স্থানে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপ্ত হলে পঞ্চপাণ্ডব রাজ্যভার তুলে দিলেন পরীক্ষিতের হাতে। তারপর স্থির করলেন শিবজীকে দর্শন করে সশরীরে তাঁরা যাত্রা করবেন স্বর্গের পথে। পাণ্ডবদের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে নারদ এলেন কাশীতে শিবের কাছে। তারপর তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জ্ঞাতি হত্যা করে পাণ্ডবেরা অনেক পাপ করেছে। এখন আবার আপনার দর্শনাভিলাষী। আপনি ওদের সহজে দর্শন দেবেন না। শিব নারদের কথা মেনে নিলেন এবং উপায়ান্তর না দেখে কাশী ছেড়ে পালালেন। পাণ্ডবেরা কাশীতে এসে শিবজীকে না পেয়ে দিশেহারার মত এখানে ওখানে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। শিবও নানাস্থান ঘুরে ঘুরে অবশেষে বর্তমান উত্তর কাশীর অরণ্যময় স্থানে এসে আশ্রয় নিলেন। পাণ্ডবরাও ছাড়বার পাত্র নন। শিবের পিছু ছাড়লেন না। এখানে এসে সমস্ত অরণ্যভূমি তোলপাড় করে ফেললেন। উপায়ান্তর না দেখে শিব মহিষের রূপ ধরে পালাবার চেষ্টা করলেন। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম শিবকে চিনে ফেললেন। এবং বিশাল বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন মহিষরূপী শিবজীকে। শিবঠাকুর তখন নিজ মূর্তি ধারণ করে পঞ্চপাণ্ডবকে দর্শন দিলেন। পরিতৃপ্ত হলেন পাণ্ডবেরা। পূজা করলেন শিবজীকে। শিবকে প্রতিষ্ঠা করলেন ঐ অরণ্যময় ভূমিতে। শিবের অবস্থানের জন্য ঐ

স্থানও কাশীতে রূপান্তরিত হলো। ঐ স্থান উত্তরাখণ্ডে বলে নাম হলো উত্তর কাশী।

এই উত্তর কাশী আবার নূতন প্রাণে জেগে উঠলো আনন্দময়ী মা'র আগমনে। দিব্যভাবে বিভোর হয়ে শ্রীশ্রীমা নিজেও মাতলেন, ভক্তবৃন্দকেও মাতিয়ে তুললেন। এইভাবে লীলাময়ী মা উত্তর কাশীর লীলা সাঙ্গ করে ফিরে এলেন দেরাদুনে। মনোহর মন্দিরে।

মা বলেন, 'মনটা সব সময় ভগবৎ-চিন্তায় অনুকূল রাখ। উহাই মনের সুখাদ্য।'

আটাশ

"(আমার) কি জাতি কি নাম, কোথায় বা সে ধাম
স্থির নাহি তার, বলি কি করে।
বলিব কি আর, আমি নহি কার,
কেউ নহে আমার, এ তিন পুরে॥
পিতা-মাতা হীনা, কে ছিল জানি না,
কেহ ত বলে না, কোথাও না শুনি।
পতি গুণাধার, কপালে আমার,
শ্মশানে, কি হল কি জানি॥
সে যাতনা ভুগি, হয়ে গৃহত্যাগী,
সংসার বিরাগী, ফিরি বনে বনে।
আনিল সে বনে, জীবন ধারণে
আছি একাকিনী প্রীতি সমরে।"

*　　　*　　　*

"মা আমারে দয়া করে, শিশুর মতন করে রাখ।
শৈশবের সৌন্দর্য ছেড়ে, বড় হতে দিও নাকো॥
শাস্ত্র পড়ে জ্ঞানী হতে, সাধ নাই মা আর মনেতে,
লুকিয়ে থাকবো তোর কোলেতে, ডাকতে চাই মা শিশুর ডাক।

ক্ষুধা পেলে কাতর স্বরে, শিশু যেমন মা, মা, করে,
ভয় পাইলে নাহি ডরে, পাইলে সে মায়ের লাগ—
এমনি আমার শিশুর ধারা, করে রাখ মা জন্ম ভরা,
শরীর বাড়ুক তায় ক্ষতি নাই, মনটি আমার শিশু রাখ ॥"

সুমিষ্ট কণ্ঠে গান গাইছেন শ্রীশ্রীমা। কাশীতে। প্রশান্ত সন্ধ্যায়। পাঁড়ের ধর্মশালায়। ভক্তপ্রবর গোপীবাবুর অনুরোধে। শঙ্করানন্দ, গোপীনাথ কবিরাজ, অখণ্ডানন্দজী, ভাইজী, ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী অমলাদেবী। কৃষ্ণপ্রিয়া, গুরুপ্রিয়া, সেবা (দেরাদুনের লেডী ডাক্তার মিস সারদা শর্মা), লছমীরাণী (কাশীবাবুর স্ত্রী), হরিরাম (শ্রীযুত হরিরাম যোশী) আশ্রমের পটলদা, শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষ, শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও নির্মলবাবুর স্ত্রী ও পুত্র অন্যান্য ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে আছেন আর শুনছেন মায়ের সুমিষ্ট কণ্ঠের সঙ্গীত।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রাণমাতানো সঙ্গীতে সে স্থান স্বর্গীয় পুণ্যভাবে হয়ে উঠলো ভরপুর। উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মন ভরে উঠলো তাঁর পরম প্রেমে ও ভক্তিরসে। সেই সময় শ্রীশ্রীমায়ের সেই প্রেমময় মুখপদ্মের দিকে ভক্তিপ্লুত মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলেন সকলে অচিন্তিতপূর্ব কোন এক কল্পলোকের কথা। মন চলে গেল তাঁদের তখন জগৎ ছেড়ে বহু উর্ধ্বে—এক পরম শান্তিময় ধামে।

এই স্থানেই ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মাকে দর্শন করে মায়ের অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীকালে 'আনন্দময়ী করুণা সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে দীন-দুঃখীর সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর ভক্তিমতী স্ত্রী অমলাদেবীও মাতৃনামে বিভোর হয়ে থাকতেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

গোপীবাবুর অনুরোধে শ্রীশ্রীমা এলেন বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের আশ্রমে। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সিদ্ধপুরুষ। শক্তিধর মহাসাধক। কাশীতে 'গন্ধবাবা' নামে পরিচিত। গোপীবাবুর গুরু। মাকে জগজ্জননীরূপে দর্শন করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন।

মা যখনই যেখানে থাকেন তখনই সেখানে বসে যায় আনন্দের বাজার। কেমন এক অভিনব ভাবের উদ্দীপনায় শত-সহস্র লোক হয়ে ওঠে সজীব, দিব্য ভাবের তালে তালে যেন নেচে বেড়ায়। ভক্তদের বিবিধ ভাব-হিল্লোলের উপর এক অলৌকিক মাধুর্য ওঠে ফুটে। যার ভাব যেরূপ, সে ভাবের মধ্যেও সে এক অপূর্ব নির্মলতা অনুভব করে আনন্দ লাভ করে। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে মা আবার শুরু করলেন সুমধুর স্বরে সঙ্গীত।

ভজরে ভাইয়া রাম গোবিন্দ হরে,
রাম গোবিন্দ হরে, রাম গোবিন্দ হরে,
রাম গোবিন্দ হরে ॥
ভজরে বহিনা রাম গোবিন্দ হরে,
যো মুখ রাম নাহি, সো মুখ ধূল পড়ে,
খোলত গাঁঠরি, ভজরে ভাইয়া, রাম গোবিন্দ হরে ॥

অকস্মাৎ ভাবতরঙ্গ উথলে উঠে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মন প্রাণ প্লাবিত করে দিলো। আত্মহারা ভক্তরা ভাবঘন দৃষ্টিতে শ্রীভগবানের ভাবাবেশিত আনন্দময়ী মা'র সেই অপরূপ মূর্তি নয়নগোচর করে অভিভূত হলেন। শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যপ্রভাবে ভক্তবৃন্দের মস্তক অবনমিত হলো। তাঁরা প্রণাম করলেন মাতৃ-চরণে।

ভক্ত ও ভগবানের লীলা চললো কাশীতে। স্বর্ণময়ী কাশীতে। সুবর্ণনির্মিত বারাণসী ধামে। শিবপুরীতে। শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের লীলা-ভূমিতে। যে স্থানে সাক্ষাৎ শক্তিই শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণারূপে চিরাধিষ্ঠিতা থেকে অন্নবিতরণে জীবের অন্নময় ও প্রাণময় শরীরের এবং আধ্যাত্মিক ভাব বিতরণে তার মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় শরীরের পূর্ণ পুষ্টিবিধান করেছেন এবং দ্রুতপদে তাকে মুক্তি বা শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের সঙ্গে একাত্মবোধে আনয়ন করছেন সেই বিচিত্র, মনোরম, পুণ্যময় নগরী কাশীতে।

আবার সেই পুণ্যময় আনন্দপূর্ণ দিনগুলিরও হলো অবসান।

কাশীর লীলা সাঙ্গ করে মা আবার যাত্রা করলেন বাংলাদেশের পথে।

মা বলেন, নামকীর্তনে স্থান পবিত্র হয়, যে করে সে ত পবিত্র হয়ই, যে শোনে সেও পবিত্র হয়।

ঊনত্রিশ

তারাপীঠ। শ্রীশ্রীমা আবার এসেছেন তারাপীঠে।

তারাপীঠ আবার প্লাবিত হয়ে উঠলো মায়ের আগমনে প্রেমের বন্যায়। বামাক্ষ্যাপার তপস্যাভূমি নূতন প্রাণে জেগে উঠলো যেন আনন্দময়ীর আগমনে পুণ্য মাতৃনামের মধুর ঝঙ্কারে।

একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। গ্রাম্য সরল মানুষ। মায়ের নামে পাগল। ভাবে বিভোর হয়ে স্বরচিত সংগীত শোনাতে লাগলেন শ্রীশ্রীমাকে।

"ওগো (ও) বাজীকরের মেয়ে
তোমার যা কিছু তা সবই গোল।
তোমার কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যা,
এ ভেলকী বোঝাও গণ্ডগোল॥
চন্দ্র সূর্য, গ্রহ তারা,
(আর) এই ধরাখানিও করলি গোল।
(তোমার) অনন্ত গোলের ভেলকি দিয়ে,
এই বুড়ো বাবাকে করলি পাগল॥
মা (তুমি) যে আলোতে ফুটিয়ে হাসি
সাজাও সাধের রঙমহাল,
আবার সেই আলোতেই শ্মশান ঘাটে,
কান্নাকাটির উঠাও রোল।
যে পথে মা শুনাও তুমি, বাজিয়ে বিয়ের শানাই ঢোল,
আবার সেই পথেই মা শুনতে পাইগো গঙ্গাযাত্রার হরিবোল॥

ওগো (ও) বাজীকরের মেয়ে
কাতর হয়ে কইছে রাধা
ওমা তোর ভেলকি ভয়ে হয়ে বিহ্বল,
আমার ভেলকি দেখার সাধ মিটেছে, মা—
দাও মা এবার শান্তি কোল ॥"

শ্রীশ্রীমা ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ হলেন ভক্তটির এই ভাবময় সঙ্গীত শ্রবণ করে।

তারাপীঠের এই মহাশ্মশানে শ্রীশ্রীমা গুরুপ্রিয়া দেবীর উপনয়ন আর মরণীর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। পৈতার পর মা বললেন গুরুপ্রিয়া দেবীকে, 'এই পৈতা যে দেওয়া হইল ইহা খেলার কথা নয়, তোমার আদর্শ ব্রহ্মচারিণী হওয়া চাই।'

১৩৪২ সন। ২৪শে মাঘ। মরণীর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে মহাসমারোহে। শ্মশানে। মহাশ্মশানে। তারামায়ের মন্দিরে। অভাবনীয় ব্যাপার। এ যেন কৈলাসে হর-পার্বতীর বিবাহ। মরণী শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথের দত্তককন্যা। আশ্রমে পালিতা। পাত্রটিও আশ্রমেরই ছেলের মত। শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত কুলদাবাবুর (শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত মুখোপাধ্যায়) পুত্র। ভোলানাথ কন্যাদান করলেন। মরণীকে ভোলানাথ খুবই স্নেহ করতেন। তাই সম্প্রদান করবার পরমুহূর্তেই আবেগে তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়লো অশ্রুবিন্দু।

বিস্ময়-পুলকে হতবাক হয়ে এই অপূর্ব মধুর দৃশ্য দেখতে লাগলো ভক্তবৃন্দ আর গ্রামের মানুষেরা। পার্শ্ববর্তী গ্রাম হতেও বহু লোক এসেছে এই অভাবনীয় দৃশ্য নয়নগোচর করে আনন্দলাভ করবার জন্য আর শ্রীশ্রীমায়ের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করে পুণ্যসঞ্চয় করবার মানসে।

বিবাহের পরদিবস কন্যাজামাতাসহ আত্মীয়স্বজনেরা বিদায় নিলেন তারাপীঠ থেকে। মহাশ্মশানের পুণ্যভূমি হতে।

লীলাময়ী মা তারাপীঠের লীলা সাঙ্গ করে, ভক্তবৃন্দসহ যাত্রা করলেন শ্রীরামপুরের পথে।

১৩৪২ সন। ২৬শে মাঘ। রাত্রিতে শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ তারাপীঠ পরিত্যাগ করলেন। আঁকা-বাঁকা মেটে পথ ধরে বিশখানি গরুর গাড়ি চললো শ্রীরামপুরের দিকে। জ্যোৎস্না রাত্রি। নিস্তব্ধ চতুর্দিক। ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রাম্য মানুষেরা। শান্ত সমাহিত এক ভাব ধারণ করে আছে। চতুর্দিকের সেই প্রশান্ত নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে কীর্তনের সুমধুর স্বর উত্থিত হলো। ভক্ত শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষ সুমিষ্ট কণ্ঠে কীর্তন শুরু করলেন,—

'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, শ্রীরাধে গোবিন্দ॥'

*　　*　　*

'হরিবোল, হরিবোল, হরি হরি বোল
কেশব মাধব গোবিন্দ বোল।'

ভাবে বিভোর হয়ে শ্রীশ্রীমাও কীর্তনে যোগ দিলেন। মায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আর আর ভক্তরাও কীর্তন দিলো শুরু করে। এইভাবে কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে শ্রীশ্রীবিশ্বজননী আনন্দময়ী মা ভক্তবৃন্দসহ পথ চলতে লাগলেন।

ত্রিশ

১৩৪৩ সন। ১৯শে বৈশাখ। দেরাদুন নূতন আশ্রমে যজ্ঞ শুরু হলো। শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ আরও চারজন ব্রাহ্মণসহ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। বৃহৎ যজ্ঞকুণ্ড নির্মিত হয়েছে। লক্ষ আহুতি প্রদানের প্রেরণায়। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিরাম যোশী, সারদা, হংস, শ্রীযুত শচী ঘোষ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের উৎসাহে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

এই হরিরাম যোশীই রায়পুরে শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করেই

অভিভূত হন এবং পরবর্তী জীবনে মায়ের মরমী ভক্ত হয়ে পড়েন। শ্রীশ্রীমা ঢাকা থেকে দেরাত্বনে এসে প্রথম দশ মাস এই রায়পুরেই শিব মন্দিরে অবস্থান করতেন। এ স্থান অতি নির্জন। কোলাহল-মুখর শহর হতে দূরে। তুরধিগম্য। তপস্যার লীলাভূমি।

কিষণপুর। দেরাত্বন শহর থেকে চার মাইল দূর। বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্যে, মাধুর্যে ও ঐশ্বর্যে প্রকৃতির নয়নাভিরাম। শ্রীশ্রীমায়ের চরণকমল স্পর্শে মহাতীর্থভূমি হয়ে উঠেছে। আশ্রম প্রতিষ্ঠার মহা-মহোৎসবে ভারতভূমির বিভিন্ন অঞ্চল হতে এসেছেন ভক্তবৃন্দ।

২৫শে বৈশাখ। শ্রীশ্রীমা'র জন্মসময়, রাত্রি শেষ প্রহরে, শ্রীশ্রীমা ও ভোলানাথের সঙ্গে ভক্তবৃন্দ প্রবেশ করলেন নূতন আশ্রমে। ঘন ঘন মঙ্গলশঙ্খ ও ঘণ্টার ধ্বনি হতে লাগলো। ভক্তরা ফুলের মালা ও কর্পূরাদি দিয়ে আরতি করতে লাগলেন ভুবন-মনোমোহিনী মাতৃমূর্তিকে, শ্রীশ্রীবিশ্বজননী আনন্দময়ী মাকে।

শ্রীশ্রীমা নববস্ত্র পরিধান করে সিঁতুর ও ফুলমালায় বিভূষিত হয়ে অপরূপ এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ধারণ করলেন। ভুবনমোহন মাতৃরূপ। সেই অলৌকিক দেবীমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন ভক্তবৃন্দ। হৃদয় তাঁদের ভরে উঠলো দিব্যানন্দে।

পূজা হলো শুরু। মাতৃমূর্তির পূজা। দেবী পূজা। জগজ্জননীর পূজা। ষোড়শোপচারে। ভক্ত মন্মথবাবু (শ্রীযুত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়) পূজা শুরু করলেন। মন্ত্রাদি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের দেহে হলো ভগবৎ আবেশ। সেই অলৌকিক দেবীমূর্তির সম্মুখে রোমাঞ্চিত দেহে পূজা করতে লাগলেন ভক্তপ্রবর মন্মথবাবু।

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

* * *

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥

*   *   *

রাত্রি প্রভাত হয়। নব উষার আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে চতুর্দিক। পথঘাট বাড়িঘর সব কিছু। উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অরণ্যরাজি। প্রতিটি ধূলিকণা। তৃণপত্র। জলবিন্দু। মাটির এই পৃথিবী। প্রভাতসূর্যের স্বর্ণকিরণ নৃত্য করতে শুরু করে দেয় নূতন আশ্রম গৃহের দেয়ালের গায়।

নবীন প্রভাতে জগৎ শুনতে পায় বোধনের শুভ শঙ্খধ্বনি। গৃহকোণ হতে উত্থিত হয় কীর্তনের সুমধুর স্বর।

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।

*   *   *

অনুখন মাধব   মাধব সুমরইত
সুন্দরি ভেলি মধাই।
ও নিজভাব   শোভাবহি বিসরল
আপন গুণ লুবধাই॥

ভক্তিবিগলিত-চিত্তে ভক্তবৃন্দ একে একে এসে মায়ের শ্রীচরণে প্রণাম করলেন। আর প্রাণভরে পান করতে লাগলেন ভুবনমোহনী মাতৃরূপ সুধা। মা কখনও হেসে হেসে কথা বলছেন আবার কখনও সমাধিস্থ হয়ে পড়ছেন। মধুর মায়ের মুখের মধুর হাসি আর অপূর্ব মধুর দৃশ্য নয়নগোচর করে মুগ্ধ হলেন ভক্তবৃন্দ।

পরদিবস। ২৭শে বৈশাখ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেওয়া হলো। বাবা

ভোলানাথ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সমাগত ভক্তবৃন্দ মস্তকে শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন।

দ্বিপ্রহরে, শ্রীশ্রীমা ও বাবা ভোলানাথের ভোগ হলো। পরে ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করলেন। মহামহোৎসবের কার্য সুষ্ঠুভাবেই হলো সম্পন্ন।

এইভাবে দেরাদুনের ভক্তবৃন্দের একান্ত ইচ্ছায় কিষণপুরে শ্রীশ্রীবিশ্বজননী আনন্দময়ী মা'র আশ্রম হলো প্রতিষ্ঠা।

শ্রীশ্রীমা'র যত আশ্রমই প্রতিষ্ঠা হোক না কেন—মা কোথাও স্থির হয়ে বসছেন না। পিছনের কোন বন্ধন, কোন আহ্বান, কোন মমতা এই মমতাময়ী জগজ্জননীকে তাঁর সঙ্কল্পিত যাত্রাপথ থেকে কোনদিন পারেনি প্রতিনিবৃত্ত করতে। মুক্তবিহঙ্গের মত দেশ হতে দেশান্তরে ভেসে বেড়াচ্ছেন।

এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে মা বলেন, 'আমি দেখি জগৎভরা একটি বাগান। জীবজন্তু উদ্ভিদাদি যত কিছু আছে সবই এই বাগানে নানা রকমে খেলছে। প্রত্যেকেরই এক একটি বিশিষ্টতা আছে। তাই দেখে আমার আনন্দ হয়। তোরা সবাই মিলে বাগানের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দিয়েছিস। আমি বাগানের এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাই, তাতে তোরা কেন এত আকুল হয়ে পড়িস।'

একত্রিশ

'কলসী ভরা জল। যতক্ষণ কলসীটা নাড়াচাড়া কর, ততক্ষণ ভিতরের জলও নড়তে থাকবে। কলসীটা কিছুক্ষণ এক জায়গায় স্থির ভাবে রেখে দাও, দেখবে ভিতরের জলও স্থির হয়ে গেছে। সেই রকম শরীরটা বেশীক্ষণ স্থির ভাবে রাখতে চেষ্টা কর, যত বেশী সময় এক লক্ষ্যে স্থির ভাবে বসতে পারবে, ততই মন স্থির হয়ে আসবে। এক দিকে মনের যেমন চঞ্চল স্বভাব, অন্য দিকে আবার শান্ত স্থির

ভাবও মনেরই স্বভাব। যে যত বেশী সময় বসে তাঁর নাম নিতে পারো, তার চেষ্টা কর। মনটা ছুটাছুটি করুক ; তোমার চেষ্টা তুমি ছাড়বে না। মনও তার ধর্ম ছাড়ছে না, তুমি কেন তোমার ধর্ম ছাড়বে ?'

শ্রীশ্রীমা বলছেন, একজন ভক্তিমতী স্ত্রী-ভক্তকে। সিমলাতে। মা এসে উঠেছেন কালীবাড়িতে। বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে।

স্ত্রী-ভক্তটি প্রশ্ন করেছেন, 'মা মন ত' কিছুতেই স্থির হয় না। মন স্থির হওয়ার উপায় কি ?' তারই উত্তরে মা উপমা সহকারে এই কথাগুলি বললেন।

আবার মা বলছেন, 'সর্বদাই যদি, "যে কোন কাজ করছি, তাঁরই সেবা করছি" এই ভাবে তাঁকে স্মরণে রাখা যায় তবে গাছের নূতন পাতা গজাইবার সময় যেমন পুরানো পাতাগুলি আপনিই ঝরে যায় তেমনই সংসার আসক্তি দূর হয়ে তাঁর প্রতি আসক্তি জাগিয়ে, বহির্মুখী ভাবগুলি অন্তর্মুখী করিয়ে দেয়। ইহাই তার স্বাভাবিক গতি। আবার দেখ না পুরানো পাতাগুলি মাটিতে পড়ে আবার গাছেরই সার হয়ে থাকে। বৃথা কিছুই যায় না জানিও।'

এবারে মা মৃদু মৃদু হাসছেন, আর বলছেন পুরুষ-ভক্তদের, তোমরা সব পাগল হইলে নাকি ? কোথায় অফিস হইতে যাইয়া জলটল খাইবে, বেড়াইতে বাহির হইবে, সব দেখি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ। আমিও তোমাদের মেয়ে। আমারও রক্তমাংসের শরীর। তোমাদেরই একজন আমি। কি দেখিতে আস ?

ভক্তরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁরা শুধু অপলক নয়নে প্রাণহরা মায়ের মাতৃরূপসুধা প্রাণ ভরে পান করতে লাগলেন। তাঁরা নিজেরাও জানেন না কিসের আকর্ষণে তাঁরা আসেন। সকলেই বললেন, 'কি যে এক নেশায় পড়েছি বলতে পারি না।'

ভক্ত ও ভগবানের লীলা চলছে। পার্বত্য শহর সিমলাতে। কালীবাড়ির ছোট্ট একটি প্রকোষ্ঠে।

মা বলছেন সমাধি পদের অর্থ। আমি ত বলি বাবা, ভাব ও কর্মের সম্পূর্ণ সমাধানের বা সমাপ্তির নামই সমাধি। জাগতিক হিসাবে বলি, তোমরা যেমন সারাদিন কাজ কর, খাও দাও, তারপর গাঢ় নিদ্রা যাও।

আর ঋষি, যিনি তাঁর রসে রসবান তিনিই ঋষি। আর মুনি, যাঁর মন তাঁহাতে লয় হইয়া এক হইয়া গিয়াছে আমি ত বলি তিনিই মুনি।

ভক্তদের প্রশ্নের মা সরস করে উত্তর দিচ্ছেন, দুনিয়ার অর্থ বলছেন, যা দুই-নিয়া, তাকেই বলে 'দুনিয়া'।

তোমরা এই দুই-নিয়া ভাবটা ছাড়িয়া, একভাব নিয়া থাকিতে চেষ্টা করো। তবেই ক্রমশঃ শান্তি দেখা দিবে। এক ভাবে থাকিলে ত আর অভাব থাকে না। অভাব না থাকিলে অশান্তি আসিতে পারে না। তাই এক মন্ত্র। একেতেই সত্য, শান্তি ও আনন্দ।

সংসার অর্থ 'সং+সার' অর্থাৎ সং যার সার, তাই তো সংসার। যতদিন তুমি নিজে কি তাহা ভুলিয়া সং সাজিয়া থাকিবে, ততদিন কি শান্তি আসিতে পারে? তুমি প্রকৃত যাহা, তাহা না হওয়া পর্যন্ত শান্তি কোথায়? তাই বলি নিজেকে চিনিতে চেষ্টা করো।

ভক্তপ্রবর হারাণবাবু ও চারুবাবুর প্রশ্নে মা আত্মা ও পরমাত্মার কথা প্রাঞ্জল ভাষায় বলছেন, 'দেখ যেমন গাছ ও ছায়া। যদি একলক্ষ্য হইয়া গাছ দেখ, তবে আর ছায়া দেখিবে না। আবার ছায়া দেখিলে গাছ দেখিবে না। আবার লক্ষ্য স্থির না হইলে গাছও দেখিবে না। তেমনি যতক্ষণ পর্যন্ত গাছ, ছায়া ও দেহাত্মবুদ্ধি আছে ততক্ষণ আত্মাও বলিতেছ। তাই গতাগতি আসা যাওয়া চলিতেছে। যখন লক্ষ্য স্থির হইবে, তখন দেখিবে এক ছাড়া দুই নাই। গাছেরই ছায়া। আর কিছুই নয়।'

একজন ভক্ত বলছেন, 'মা, আমার পূজা জপ ইত্যাদি কিছুতেই মন বসে না।'

মা প্রত্যুত্তরে বলছেন, 'দেখ না, খেজুর গাছ। প্রথমে কাটলেই কি আর রস বের হয়? কাটতে কাটতে পরে ঝর্ ঝর্ করে রস বের হয়। সেই রসে আবার কত শক্ত জিনিসও তৈরি করা হয়। তেমনি ভক্তি শ্রদ্ধায় নাম জপেই মন ধীরে ধীরে গলবে। তোমরা নিয়ম মত কাজ করে যাও।'

'তোমাদের আহার বিহারের মধ্যে এমন কোন দোষ নিশ্চয়ই থাকে, যাতে তোমার মনটা বিক্ষিপ্ত করে দেয়, নামে বসতে দেয় না। এমন কি, কোন দৃশ্যবস্তুর দোষে কি কোন লোকের সংস্পর্শে, কি তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় ও সব রকমেই তোমার অজ্ঞাতসারেও তোমার মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণ ঘটে যেতে পারে। তাই যদি কারও এই দিকে আসতে হয়, তার সকলের সঙ্গ বর্জন করে একান্তে থাকা নিতান্ত দরকার। প্রথম প্রথম সর্বদা তার লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন মনটা তাঁর দিকে যেতে বাধা না পায়। অবশ্য সংসারীর পক্ষে সকলের সঙ্গ বর্জন করে থাকা সম্ভব নয়। তারা সর্বদা সৎসঙ্গ করবে, সদালোচনা করবে। সৎলোকের সঙ্গ করলে বা তাঁদের জীবনী পড়লেও মন শুদ্ধ হয়। তাঁর দিকে যাওয়ার সহায়ক হয়।'

'অনেক সময় পূর্বজন্মের কর্মও এই জন্মে সৎপথে যাওয়ার বাধা বা সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। পূর্বজন্মের কর্মের প্রভাবও এই জন্মে প্রকাশ হয়। তাতেও এক এক সময় এক একটা ভাব প্রবল হয়ে দাঁড়ায়।'

* * *

১৩৪৩ সন। আষাঢ় মাস। সিমলার কালীবাড়িতে শ্রীশ্রীমা তাঁর ছোট্ট বিছানাটুকুর উপর বসে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মায়ের আহ্বানে কালীবাড়ির ছোট্ট ঘরটি

তীর্থক্ষেত্র-স্বরূপ হয়ে উঠেছে। স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তরা অপলক নয়নে শ্রীশ্রীমা'র ভুবনমোহিনী মাতৃরূপসুধা পান করছেন আর শ্রীমুখের অমৃতময় বাণী শ্রবণ করছেন।

'দেখ একাগ্রতা ও সরল বিশ্বাসই তাঁকে পাওয়ার উপায়। কেবল শিশুর মত বিশ্বাস চাই। অভ্যাসের দ্বারা বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে ওঠে। শুদ্ধ বিশ্বাস উদয় হলে সরল প্রার্থনা আসে। প্রার্থনায় সত্যিকারের ভাব জাগলে কৃপা করে তিনি ফলস্বরূপে প্রকাশ পান।

প্রার্থনা সাধনার বিশেষ অঙ্গ। প্রার্থনার শক্তি অমোঘ। প্রার্থনায় জীব ও জগতের প্রাণ অবস্থিত। যখন যা প্রাণে আসে তাঁকে জানাবে আর সরল ও ব্যাকুল হয়ে তাঁর প্রতি শরণাগতি প্রার্থনা করবে।

আর কৃপা বললেই অহৈতুকী কৃপা বোঝায়। যখন কৃপা হবার তখন তাঁর ইচ্ছাতেই কৃপা অবতীর্ণ হয়। যেমন দেখ, শিশু খেলা করতে করতে মাকে ভুলে গেছে, মা হঠাৎ গিয়ে তাকে কোলে নিলেন। শিশু না ডাকতেই মা'র স্নেহ প্রকাশ হলো।

তাঁর কৃপা তো সকলের উপর সমানভাবে রয়েছে। যখন উহা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করার সময় বা যোগ্যতা আসে তখন সে দেখতে পায় যে সে কৃপালাভ করছে।'

আবার মা বলতে লাগলেন, গুরুনির্বিশেষে বীজমন্ত্র জপের উপযোগিতা সম্বন্ধে। 'দেখ না, যেমন বীজটি মাটিতে পুঁতে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। বীজটি যদি বারে বারে উঠিয়ে দেখ, তবে আর গাছ বের হয় না। যাঁর নিকট হতেই হোক, যদি বীজমন্ত্রটি পাও আর তা মনের ভিতর গোপন রেখে নিয়ম মত কাজ করে যাও, তবে সময়ে নিশ্চয়ই তোমার সেই বীজ হতে গাছ হয়ে ফুল ফল প্রসব করবে। গাছের বীজের মত তাকে গোপনে রেখে জল দিতে থাক। সময়ে গাছ বের হবেই। গুরু যেমনই হোক, তুমি যে বীজ পেয়েছ তা ত তাঁর নাম ঠিকই। তবে কাজ হবে না কেন?

একটি শিশু যদি একটি বীজ তোমার হাতে দিয়ে যায়, শিশু জানে না কিসের বীজ ছিল। বীজের খবর জান নাই বলে কি নিয়ম মত কাজ করলে গাছ বের হবে না? গুরু যেমনই হোক, তুমি যদি বীজটি নিয়ে নিয়ম মত কাজ কর নিশ্চয়ই ফল হবে।'

এই প্রসঙ্গে মা একটি গল্প বলছেন, "একটি লোক একবার দীক্ষা নেবার জন্য খুব উৎসুক হয়ে এক সাধুর কাছে যায়। সাধুটি কিছুতেই দীক্ষা দেবেন না। ঐ লোকটিও ছাড়বে না। অবশেষে সাধুটি একরূপ রাগ করেই বলে দিলেন, 'যা নে গোপীয়ানন্দন।' লোকটি পরম শ্রদ্ধাভরে সাধুটিকে প্রণাম করে 'গোপীয়ানন্দন' নাম দিনরাত জপ করতে লাগলো। ভুলে গেল খাওয়া দাওয়া নিদ্রা। এইভাবে আহার নিদ্রা না করলে লোকটি পাগল হয়ে যাবে ভেবে, তার একজন আত্মীয় তাকে বললো, তোমার গোপীয়ানন্দন নাম আমি জপছি। তুমি খেয়ে ঘুমিয়ে নাও। সে কিছুতেই নাম ছাড়বে না। অনেক পীড়াপীড়িতে সে নামটি ঐ আত্মীয়ের কাছে দিয়ে কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আত্মীয়টি ভাবলো সে তো ঘুমুচ্ছে এখন আর কি নাম করবো? গোপীয়ানন্দন কি আবার একটা বীজ নাকি? এই কথা ভেবে সে নাম ছেড়ে উঠে গেল। এদিকে সাধকটি জাগরিত হয়ে দেখে, তার নাম বন্ধ হয়ে গেছে। সে তখন পাগলের মত ঐ আত্মীয়টির কাছে গিয়ে বললো, 'আমার নাম আমায় দাও।' একবার যে নাম তাকে দিয়েছে আবার সে নাম, সে ফিরিয়ে না দিলে সে নিতে পারবে না, এই তার বিশ্বাস।

তখন আত্মীয়টি খুবই অবজ্ঞাভরে বললো, 'নে তোর ঘণ্টানন্দন'। সাধকটি কিন্তু এই অবজ্ঞা বুঝলো না। যাকে নাম দিয়েছিল তার নিকট হতে যা পেয়েছে, তাই সে মহা আনন্দে জপতে লাগলো।

অবশেষে সে লোকালয় ছেড়ে চলে এল বনে। এক বৃক্ষতলে বসে বসে জপতে লাগলো সেই নাম। 'ঘণ্টানন্দন'। এদিকে

শ্রীকৃষ্ণের আসন টললো। তিনি শ্রীরাধাকে বললেন,—চল, আমার এক ভক্তকে দেখবে চল। এতবড় ভক্ত আমার আর নেই।

রাধাও ভাবলেন—দেখে আসি, কে এতবড় ভক্ত। দুইজনে চললেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরাধারাণী।

শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব লুকোচুরি খেলা। তিনি দূরে এক বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে রইলেন আত্মগোপন করে।

শ্রীরাধারাণী এক সাধারণ স্ত্রীলোকের বেশে ঐ সাধুটির কাছে গিয়ে দেখলেন সে চোখ বুজে জপছে, 'ঘণ্টানন্দন'। শ্রীরাধা সাধকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কার নাম জপছো? পুনপুনঃ জিজ্ঞাসা করায় সাধুটি চোখ খুললেন এবং চিনতে পারলেন শ্রীরাধারাণীকে। মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার পতির নাম জপ করছি।' শ্রীরাধাও মৃদু মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন,—'বল তো আমার পতি কোথায়? নামের প্রভাবে সাধুটির তখন দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে। অদূরে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণকে তিনি দেখিয়ে দিলেন।

পরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি দর্শন করে সাধুটি মুক্তিলাভ করলেন।"

গল্প শেষে মা বললেন, দেখ গোপীয়ানন্দন-ঘণ্টানন্দন নাম জপ করেও সাধুটি মুক্তিলাভ করলো। একাগ্রতা ও সরল বিশ্বাসই তাঁকে (সেই পরমপুরুষকে) পাওয়ার একমাত্র উপায়।

বত্রিশ

সিমলা। পর্বতারণ্যে শোভিত সিমলা।

দীর্ঘ উপলবন্ধুর পথ চলে চলে নানা তীর্থাদি দর্শন করে মা আবার এসে উপস্থিত হলেন সিমলায়। ভক্তহৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনায়। সিমলার ভক্তদের একান্ত আগ্রহে।

সিমলার আকাশ বাতাস যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো শ্রীশ্রীবিশ্বজননী আনন্দময়ী মা'র অবস্থানে। কৃষ্ণনামের কল-কোলাহলে। ঘন ঘন শঙ্খ-ঘণ্টারোলে। সে এক মহাপুণ্যময় মুহূর্ত। যেন যুগান্তব্যাপী তপস্যার এক পরম শুভলগ্ন।

নামযজ্ঞ। কালীমায়ের মন্দিরে। সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অখণ্ডভাবে নামগান। কৃষ্ণগুণগান। কৃষ্ণকীর্তন।

শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ ও ভক্তবৃন্দ কীর্তনের ঘরে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে করতে কীর্তন করছেন। সুললিত ছন্দে। অমৃত-নিস্যন্দী ভক্তিপ্লুত সুরে।

'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥'

* * *

সন্ধ্যা সবে নেমে এসেছে ধরিত্রীর বুকে। মধুর মলয় বাতাস নানা সুবাস মেখে মাতিয়ে তুলেছে চতুর্দিক। রূপে রসে গন্ধে বিশ্বজগৎ হ'য়ে উঠেছে পুলকিত। তার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে জাগে পুলক-শিহরণ।

বিশ্বমাতার আগমনে প্রকৃতি যেন আজ মেতে উঠেছে নব-উৎসবে। মহামহোৎসবে। নব-চৈতন্যের প্রাণশক্তিতে।

জগজ্জননী নিজেও মেতেছেন। ভক্তদেরও মাতিয়েছেন কীর্তনানন্দে কৃষ্ণগুণগানে। ভাবোন্মাদনায়। ভাব-বিহ্বলতায়। মহাভাবময়ীর মহাভাব। মহাভাবে বিভোর হয়ে শ্রীশ্রীমা'র শরীর নৃত্যেরই তালে তালে উঠতে লাগলো। আবার পড়ে গেল। মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। যেন বাতাসে উড়ানো কাপড়খানির মত শরীর কখনও পড়ছে, কখনও উঠছে, কখনও মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আবার কখনও ঘুরে ঘুরে চলছে। এইভাবে মায়ের শরীরে অস্বাভাবিক ক্রিয়া হতে লাগলো। তখন কীর্তনের ঘরটি অনির্বচনীয় ভাবস্পন্দনে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করলো। মুগ্ধ ও অভিভূত হলো ভক্তবৃন্দ। ভাব-বিহ্বল হয়ে শ্রীশ্রীমাকে ঘিরেই ভক্তবৃন্দরা কীর্তন করতে লাগলো।

অনন্তলীলাময়ী মা ভাবানন্দে বিভোর হয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি ধারণ করলেন। মুখমণ্ডলে ফুটে উঠলো তখন এক অপার্থিব দিব্য-জ্যোতিঃ।

ভাব। মহাভাব। ভাবসমাধি। অকস্মাৎ শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হতে নিঃসৃত হতে লাগলো স্তোত্র। অনর্গলভাবে। দেব-ভাষায়। অপূর্ব সে উচ্চারণ। মধুর সে কণ্ঠস্বর। পুলক শিহরণ জাগে অন্তরে অন্তরে। যেন স্বর্গীয় কোন দেবী দেব-ভাষায় পাঠ করছেন স্তব। যেন স্বয়ং ব্রহ্মা জগৎস্বামী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গের জন্য স্তব করছেন। কিছু সময় পর ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীমা'র ডান হাত উঠে গেল, ভ্রূমধ্যে আঙুল দিয়ে চাপা দিলেন। স্তবও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

স্তোত্র বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ ভক্তি-বিগলিত চিত্তে ভূমিষ্ঠ হয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করলেন। হৃদয় তাদের ভরে উঠলো দিব্যানন্দে।

মা তখনও বসে আছেন। স্থির হয়ে। জড়বৎ। যেন অখণ্ডরসে জমে আছেন। সারা দেহ ভূমানন্দে ঢল-ঢল। ভক্তরা মা-মা ডাকে মুখরিত করে তুললো ছোট্ট ঘরটি। মা হাসি-হাসি মুখে ভক্তদের দিকে চাইছেন কিন্তু শ্রীমুখ হতে শব্দ নিঃসৃত হচ্ছে না। এইভাবে অনেক সময় অতিক্রান্ত হলো। রাত্রি অধিক হতে অধিকতর হতে লাগলো। ধীরে ধীরে আবেশ-জড়িত কণ্ঠে দুই-একটি কথা বলতে লাগলেন। সে সময় তাঁর আধো-আধো জড়ানো কথা সমবেত ভক্তদের হৃদয়কে যেন অমৃত রসে পূর্ণ করে তুললো। তারপর ক্ষুদ্র শিশুটির মত 'আমি তবে শুই' বলে শয্যা গ্রহণ করলেন।

* * *

অবশেষে লীলাময়ী মা সিমলার লীলা সাময়িকভাবে সাঙ্গ করে ভক্তবৃন্দসহ চলে এলেন সোলনে। সোলনের রাজার আমন্ত্রণে। সোলনের রাজা দুর্গা সিং শ্রীশ্রীমায়ের পরমভক্ত। মা তাঁর নাম রেখেছেন 'যোগীভাই'।

রাজাসাহেব নিঃসন্তান এবং ধর্মভীরু। মায়ের নামে আত্মহারা। মায়ের কথায় অখণ্ড বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীমা এসে উঠলেন রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। শোগীবাবার প্রতিষ্ঠিত এই বিগ্রহ। মন্দির-সংলগ্ন গৃহে কীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মা ভক্তবৃন্দসহ এসে বসলেন কীর্তনের ঘরে। শোগীবাবা খুবই বৃদ্ধ। সিদ্ধপুরুষ। এ অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা সাধু।

রাজাসাহেব মায়ের চরণ বন্দনা করলেন। অন্যান্য ভক্তরা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে কীর্তনে যোগ দিলেন।

রাণী ও রাজমাতা ও রাজপরিবারের মেয়েরা মাকে প্রণাম করে চিকের আড়ালে মন্দিরের ভিতর বসলেন।

রাজাসাহেবও প্রজাবৃন্দসহ কৃষ্ণকীর্তন শুরু করলেন। সে এক অভাবনীয়, অনির্বচনীয় দৃশ্য।

ভক্তগণের আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো,

হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

* * *

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল-গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ মধুসূদন।

বৃষ্টিসিক্ত রাত্রি হয়ে আসে গভীর। রুদ্ধ বাতায়নে আঘাত ক'রে চলে বৃষ্টির জলবিন্দু। বাতায়নের কোণ বেয়ে গড়িয়ে চলে জলের ধারা। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো এসে জানালাগুলিকে ক'রে দেয় শুভ্র। ভিতরে ঘরে অবিরাম চলে কীর্তন। রাজাসাহেব ভৃত্যসহ বিপুল উল্লাসে হাততালি দিয়ে তালে তালে নেচে নেচে কীর্তন করতে লাগলেন।

কীর্তনের গানে যে আছে, 'মিলে চাকরে নফরে, ভূপাল কৃষকে সবাই বলে হরিবোল।'

অপার মহিমময়ী মা আজ সেই কাহিনীকে বাস্তবে পরিণত

করালেন। ভক্তিরস সিক্ত করে ভক্তগণের হৃদয় আলোকিত করলেন।

মা বলেন, 'নাম কর। নামেই সব হয়। নাম জপেই চিত্ত শুদ্ধ হয়, সেই স্থানও পবিত্র হয়। কীর্তনেও, যে কীর্তন করে, তার চিত্ত শুদ্ধ হয়। যেখানে কীর্তন হয়, সেই স্থান পবিত্র হয়। যে কীর্তন শোনে সেও পবিত্র হয়।'

* * *

শ্রীশ্রীমা সোলন হতে দেরাদুন হয়ে আবার ফিরে এলেন সিমলায়। আবার সিমলা সোলন প্লাবিত হয়ে উঠলো মায়ের আগমনে।

মা বলছেন ভক্তদের—'বন্ধন জ্বালা অসহ্য হলেই মুক্তির পথ পাওয়া যায়। আর বিষয়বদ্ধ থাকলে শান্তি পাবে কি প্রকারে? আমি বলছি না সকলেই জঙ্গলে চলে যাও। সংসারে থেকেও শান্তি লাভ করা যায়। সংসার তাদের কাছেই তাপময়, যারা 'সং'-কে সার করেছে। আর যারা জানে, আমরা সং সেজে আছি মাত্র, আমাদের প্রকৃতরূপ এ নয়, সংসার তাদের তাপ দিতে পারে না। ত্রিতাপ জ্বালা এড়াবার জন্যই তপস্যা করতে হয়। তপস্যা মানে আমি ত বলি তাপ+সহা। এক তাপ দিয়েই আর এক তাপ নষ্ট করা যায়। শুদ্ধ বন্ধন নিলেই অশুদ্ধ বন্ধন কেটে যায়। পরে সবই চলে যায়।

শ্রীশ্রীমা এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছেন—ভক্তদের নিকট। সিমলার কালীবাড়িতে।

এক রাজা ছিল। তাঁর ধন-দৌলতের ছিল না অভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। লোকমুখে শুনলেন, গুরুর নিকট মন্ত্র নিয়ে কাজ করলে শান্তি পাওয়া যায়। তখন তিনি কুলগুরুর খোঁজ করলেন। এতদিন গুরুর কোন খোঁজই ছিল না। গুরু অতি অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছিলেন। রাজা

তাঁকে স্মরণ করেছেন জেনে খুবই আনন্দিত হলেন। গুরু রাজার নিকট এসে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর নিকট মন্ত্র নিয়ে জপতপ করলেই শান্তি পাবেন। তারপর গুরু শুভদিন দেখে রাজাকে মন্ত্র দিলেন। গুরুরও আর্থিক অবস্থা ফিরে গেল। এদিকে রাত্রি যায় দিন আসে। সপ্তাহ যায় মাস ঘুরে আসে। কিন্তু রাজার মনে শান্তি আসে না।

একদিন রাজা গুরুকে ডেকে বললেন, 'দেখুন, আপনার কথামত আমি মন্ত্র নিয়েছি। আপনি বলেছিলেন, মন্ত্র নিয়ে জপতপ করলেই শান্তি পাওয়া যাবে। আমি নিয়মিত জপাদিও করলাম, কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না। আপনাকে সাত দিন সময় দিলাম। যদি এর মধ্যে আমাকে শান্তির পথ বলে দিতে না পারেন তবে আপনাকে এবং আপনার পরিবারস্থ সকলকেই বধ করবো।'

রাজার আদেশে গুরুর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দুশ্চিন্তায় দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

গুরুর ছিল মাত্র একটি পুত্রসন্তান। সেও ছিল মূর্খ। অপদার্থ। লেখাপড়া ভালবাসতো না। সারাদিন বনে জঙ্গলে ঘুরতো, শুধু আহারের সময় বাড়ি আসতো। এ দিকে এক এক দিন ক'রে ছদিন অতিক্রান্ত হলো। সপ্তম দিনে গুরুর বাড়িতে আর রান্না হলো না। দুশ্চিন্তায় গুরু ও তাঁর স্ত্রী অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে রইলেন। এমন সময় ছেলে বাড়ি এসে দেখে খাওয়ার কোন যোগাড়ই নেই। তখন খুবই রাগারাগি করতে লাগলো। প্রত্যুত্তরে তার বাপ-মাও তাকে তিরস্কার করলেন। এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখে পুত্র কিছুই বুঝতে না পেরে পিতাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমরা খাওয়াদাওয়া না করে শুয়েই বা আছো কেন? আর আমাকে বৃথা তিরস্কারই বা করছো কেন?'

তখন তার পিতা আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বলে বললেন, 'আগামী কল্যই রাজাকে শান্তির পথ বলতে না পারলে সকলেরই প্রাণ যাবে।'

এই কথা শুনে গুরুপুত্র মৃদু হেসে বললো, 'তার জন্য চিন্তা কি? আমি রাজাকে শান্তির পথ বলে দেবো। রাজা আপনাকে জিজ্ঞাসা করলেই আমাকে দেখিয়ে দেবেন। যা হয় আমি বলবো। এখন আপনারা আহারের ব্যবস্থা করুন।' পুত্রের কথায় পিতা সাময়িক-ভাবে আশ্বস্ত হলেন এবং আহারাদি করলেন। কি জানি, এমন পুত্রের উপর কি-ই বা ভরসা!

পরদিন পিতা-পুত্র যথাসময়ে রাজবাড়ি গেলেন। রাজা বললেন, 'গুরুদেব, আজ আপনার শেষ দিন। আমি আপনার নির্দেশমত গত সাতদিনও জপাদি করে দেখলাম, কোনই শান্তি পেলাম না। আজও যদি শান্তির পথ বলতে না পারেন তবে আপনাদের সকলেরই শিরশ্ছেদ হবে।' গুরু তখন নিজ পুত্রকে দেখিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আপনার কথার উত্তর আমার এই পুত্র দেবে।'

রাজা তখন মৃদু হেসে গুরুপুত্রকে বললেন, 'পারবে বলতে শান্তির পথ?' প্রত্যুত্তরে গুরুপুত্র বললো, 'হ্যাঁ মহারাজ, আমি বলবো শান্তির পথ, তবে আপনাকে আমার কথা শুনতে হবে।'

রাজা মৃদু হেসে সম্মত হলেন।

তখন গুরুপুত্রের নির্দেশমত রাজা ও গুরু দুইগাছি দড়ি নিয়ে গভীর বনে এসে উপস্থিত হলেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখা গেল তিনটি বড় বড় বৃক্ষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। গুরুপুত্র পিতা ও রাজা মহাশয়কে ঐ স্থানে অপেক্ষা করতে বলে, দুইগাছা দড়ি দিয়ে রাজা ও পিতাকে দুইটি বৃক্ষের সঙ্গে বেঁধে নিজে মধ্যের বৃক্ষটির উপরে উঠে মহানন্দে গান শুরু করে দিলো।

এদিকে বন্ধনের যন্ত্রণায় রাজা অস্থির হয়ে গুরুপুত্রকে বন্ধনমুক্ত করতে আদেশ দিলেন; কিন্তু গুরুপুত্রের সে দিকে ভ্রুক্ষেপই নেই। সে আনন্দ উৎসবে মেতে আছে। তখন রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে গুরুকে আদেশ করলেন বন্ধনমুক্ত করতে।

গুরু ধীরগম্ভীর স্বরে বললেন, 'মহারাজ, আমি নিজেই আবদ্ধ,

আপনাকে কিরূপে মুক্ত করবো ?' এই সামান্য কথাতেই কাজ হলো। রাজার ক্রোধের উপশম হলো। রাজা ভাবতে লাগলেন, তাই তো—তাই তো—অকস্মাৎ রাজা দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। তিনি দেখলেন—সত্যই ত, বন্ধনের মধ্যে থেকে আমি শান্তির আশা করি কি প্রকারে ? আর যে ব্যক্তি নিজেই বদ্ধ, সে-ই বা আমাকে মুক্ত করবে কি প্রকারে ? আমি রাজত্ব করে বিষয়জালে আবদ্ধ হয়ে শান্তির আশা করছি, আমার মত মূর্খ কে ?

অতঃপর রাজা গুরুপুত্রকে বললেন, এখন আমার বন্ধন মোচন কর। আমি শান্তির পথ পেয়েছি।

তখন গুরুপুত্র রাজা মহাশয়কে বন্ধন হতে মুক্ত করলো। রাজা আর সংসারে ফিরলেন না। সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন।

শ্রীশ্রীমা গল্পটা সমাপ্ত করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। মা আনন্দময়ীর মুখনিঃসৃত গল্প যেন অমৃতরসধারা। কঠিন তত্ত্বকথা মা সরল গল্পের মাধ্যমে ভক্তগণকে দিলেন বুঝিয়ে।

মা বলেন, যাঁকে ভাবলে সব ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, একমাত্র তাঁকেই ভাবা উচিত। সর্বদা ভগবানের ধ্যান করা। তাঁর নাম লইতে চেষ্টা করা। তাঁর নাম ভজলে সর্বরোগ আরোগ্য হয়।

* * *

মা বলছেন ভক্তিমতী স্ত্রী-ভক্তদের, 'প্রতিদিনই একটা নির্দিষ্ট সময়ে ১০ মিনিট তাঁকে ডাকবে। যদি সংসারে কাজের জন্য এক জায়গায় চুপ করে বসতে না পার, তবে অন্ততঃ সেই নির্দিষ্ট সময় মৌন থেকে (হাতে কাজ কর) যার যে ভাবে ইচ্ছা, তাঁকে স্মরণ করবে। ইহাতে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বিচার নাই। কাপড় ছেড়ে শুচি হওয়ার দরকার নেই। এমন কি সেই নির্দিষ্ট সময়ে যদি পায়খানায় যাও, তাও কিছু বাধা নাই। সেখানে বসেই ১০ মিনিট তাঁকে ডাকবে। মনে করবে এই দশ মিনিট তাঁকে দিয়েছি। পশু পক্ষী যেমন নির্দিষ্ট

সময় ডেকে ওঠে, কোন বাধা বিঘ্ন মানে না, তোমরাও তেমনি একটা নির্দিষ্ট সময় তাঁকে দিতে চেষ্টা কর। এই সময়টি তাঁকে সমর্পণ করেছি এই ভাবটি রেখো।

মায়ের মুখের অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করে নিজেদের ধন্য মনে করলেন ভক্তিমতী স্ত্রী-ভক্তরা। প্রাণহরা মা সিমলা পাহাড়ে এসে পাহাড়ী, পাঞ্জাবী ও বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেরই নিলেন প্রাণ হরণ করে। কুলবধূদের মধ্যেও নামকীর্ত্তনের প্রচলন করে দিলেন। শ্রীশ্রীমা কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা বিতরণ করে চলেছেন মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন মনুষ্যসমাজে। দুঃখী, তাপী মানুষের সংসারে।

তাই তো মা বলেন, 'তোমরা সাংসারিক সুখে দুঃখেও সেই সময়টুকু তাঁকে ডাকতে ভুলো না। মনে রেখো সে সময়টুকু তাঁকে দেওয়া হয়ে গেছে।'

মা আনন্দময়ী হলেন প্রেমসুধা-সমুদ্র। এমন কৃষ্ণনাম রত্ন, ত্রিভুবনে যা মূল্য দিয়েও ক্রয় করা যায় না সেই অমূল্য রত্ন যেচে দান করছেন।

'আনন্দময়ী মা'—যে নাম শ্রুতিপথে প্রবেশ করে হৃদয়-সরোবরকে করে পূর্ণ। উদ্বেলিত হৃদয় হতে সেই অমৃত নয়ন ছাপিয়ে পড়লে অধম দেহ-মরুভূমিতেও উত্থিত হয় পুলকাঙ্কুর। যাঁর নামেই মিটে যায় সমস্ত শোক। তাপ। মা যে আনন্দদায়িনী আনন্দময়ী। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

তাই তো ভক্তপ্রবর ভাইজী প্রবর্ত্তন করলেন 'মা'-নামের কীর্ত্তন—

মা মা মা মা মা
ডাক মা মা মা মা
বল মা মা মা মা
গাও মা মা মা মা
ভজ মা মা মা মা
জপ মা মা মা মা
ডাক, বল, গাও, ভজ, জপ, মা মা মা ॥

মা বলেন, বেতালা বেসুরা যেমন গান-কীর্তন জমে না; তেমনি উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুর বা তাল না থাকলে সাধরণতঃ মন বসে না।

তাই তো শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সহজ ও সমভাবে নাম বা মন্ত্র জপ কর। শ্বাস ও নাম এক যোগে চলতে চলতে দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে প্রাণবায়ুর গতি স্ব-ভাবে এলে দেহ স্থির ও মন একমুখী হবে এবং প্রত্যক্ষ দেখা যাবে যে জীবমাত্রেই এক মহাপ্রাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

তেত্রিশ

আজকাল মাকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন ভোলানাথ আর ভক্তরা।

'এক বস্ত্রেই যাবো' বলে সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র বা একখানি কম্বল পর্যন্ত না নিয়ে মা নিরুদ্দেশের পথে করেছেন যাত্রা। প্রব্রজ্যার পর সত্যলাভের জন্য তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ও নানাস্থানে ধ্যানধারণায় রত হলেন শ্রীশ্রীমা।

কলকাতা থেকে ভক্ত শ্রীযুত যতীশ গুহ মহাশয় কাশীতে স্বামী শঙ্করানন্দকে লিখছেন, 'মা ১৮ই শ্রাবণ (সোমবার) প্রাতে শ্রীরামপুরে ভোলানাথ প্রভৃতি সকলকে নিয়াই যান। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই ভোলানাথের সঙ্গে সকলকে কলিকাতা ফিরাইয়া দিয়াছেন। মা, বিরাজমোহিনীদিদি ও রাজসাহীর প্রফেসর অটলবাবুর ভাগিনেয় কমলকে নিয়া শ্রীরামপুর হইতে রাত্রির গাড়িতে কোথায় চলিয়া যান কেহই জানে না। ভোলানাথকে ঢাকুরিয়া পিসিমার বাসায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইতে বলিয়া গিয়াছেন।

ভোলানাথ লিখছেন বিন্ধ্যাচলে গুরুপ্রিয়া দেবীকে 'মা বলিয়া

গিয়াছেন কেহ যেন তাঁর জন্য চিন্তা না করে এবং তাঁর অনুসন্ধান না করে। তিনি সময়মত আসিয়া সকলের সহিত মিলিবেন।'

রাজসাহী থেকে ভক্তপ্রবর অটলবাবু লিখছেন, 'এত বৎসর এত কান্নার পর মা জননী আসিয়া দেখা দিয়াছেন। আমার সব ক্ষোভ মিটিয়াছে। জীবনে এত আনন্দ ও এত আশীর্বাদ আর পাই নাই। এখন প্রার্থনা করি শীঘ্র শীঘ্র যেন সংসারের ঋণমুক্ত হইয়া মা'র কোলে যাইয়া শান্তি পাইতে পারি। ধর্মশালা সুবিধামত না পাওয়ায় মা আমার খোলা বারান্দায় এক রাত্রি কাটাইয়া কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াছেন, ইহাও মা'র কৃপা।'

২৭শে শ্রাবণ ১২ই আগস্ট (১৯৩৬ সন) শ্রীযুত যতীশ গুহ মহাশয় কলিকাতা হতে বিন্ধ্যাচলে গুরুপ্রিয়া দেবীকে লিখেছেন, 'পুরীধামের জটিয়া বাবার আশ্রম হতে শ্রীযুত মাখনবাবু কলিকাতা পত্র দিয়াছেন যে মা পুরীতে গিয়াছেন। এইরূপ অযাচিতভাবে হঠাৎ মাকে পাইয়া তাঁহারা মহা আনন্দে আছেন। জটিয়া বাবার আশ্রমে খুব উৎসব হইয়াছে। মা'র ভুবনেশ্বর যাওয়ার কথা ইত্যাদি।'

এই পুরীধামেই শ্রীশ্রীমা অযাচিতভাবে দর্শন দান করেন বৃদ্ধ শ্যামদাস বাবাজীকে। সে এক অভাবনীয় ঘটনা।

নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন করে মা এলেন ভুবনেশ্বরে। ভুবনেশ্বর থেকে গোমো, আদ্রা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করে, আগ্রা পৌঁছুলেন। আগ্রা হতে মথুরায়। রাখাল রাজা কৃষ্ণের লীলাভূমিতে। এসে উঠলেন এক ধর্মশালায়। ভক্তরা কেহই পেলেন না সংবাদ। এখান হতে কমলকে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন কলকাতাতে। যাত্রাপথে একমাত্র সঙ্গিনী বিরাজমোহিনী।

কমলকে বিদায় দিয়ে মা এসে বসলেন বিশ্রাম ঘাটে। কিছু ফল কিনে এই ঘাটে বসেই বিরাজমোহিনী মাকে খাইয়ে দিতে লাগলেন। চারিদিকে ভিড় জমে গেল। শ্রীশ্রীমা'র ঐ রুক্ষ চুল, আলুথালু বেশ আর অপরের হাতে খাওয়া দেখে পাগলিনী মেয়ে

ভেবে সকলেই হাসতে লাগলো। ভগবৎ ভাবের উন্মাদিনী মাও সকলের সঙ্গে সঙ্গে হাসতে লাগলেন। কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী রাধারাণী। আনন্দময়ী রাই-কমলিনী।

ধীরে ধীরে সূর্যদেব অস্তমিত হলেন। লজ্জার রক্তিম আভার মত অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়লো জলের উপর। সন্ধ্যা আগত দেখে একদল হাঁস করুণা-কলকণ্ঠে ঘরে ফিরে চললো।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী তখনও বসে আছেন বিশ্রাম ঘাটে। ভিখারিণীর বেশে। কোথায় যাবেন, কিছুই ঠিক নাই।

অকস্মাৎ এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটলো। একজন কাশ্মীরী মহিলা কোথা হতে ছুটে এসে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণকমলে লুটিয়ে পড়লেন। মহিলাটি মায়ের ভক্ত। এইভাবে, এই স্থানে, একাকিনী মাকে অকস্মাৎ দর্শন করে তিনি আশ্চর্যান্বিত এবং অভিভূত হয়ে পড়েন। পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে, মাকে একটি মন্দিরে থাকবার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন।

এই স্থানেই কাশ্মীরী পণ্ডিত শ্রীযুত শিবনারায়ণ মাকে জগজ্জননীরূপে দর্শন করে মায়ের অনুরক্ত হয়ে পড়েন। ইনিই মায়ের বৃন্দাবন যাত্রাপথের সঙ্গী হয়েছিলেন।

আবার মা শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবন ধামে এসে উপস্থিত হলেন। এসে উঠলেন বর্ধমানরাজের ধর্মশালায়। ম্যানেজার যোগেন্দ্রবাবু মা'র পূর্বপরিচিত। পরদিবস তিনি মাকে কিনে দিলেন আগ্রার টিকিট। আগ্রা হয়ে মা এলেন সুলতানপুরে। সুলতানপুরে এসে উঠলেন কালুমল্লির ধর্মশালায়। সেখানে মা'র ভক্ত সারদার বোন লেডি ডাক্তার রমা শর্মা মায়ের থাকবার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। পরদিবস এলেন ফয়জাবাদ। ফয়জাবাদ থেকে এসে পৌঁছুলেন সেই বহু বিখ্যাত উত্তর কোশলের রাজধানীতে। সেই বহু সাধুসন্তের চরণপূত প্রাচীন অযোধ্যাতে। রামায়ণের অযোধ্যা নগরীতে।

এসে উপস্থিত হলেন রাম মন্দিরে। সরযূর তীরে। শুনতে বসলেন রামনাম। আর তনুমনকে করে তুললেন নাম-মালা। ভাবে বিহ্বল হলেন। মন্দিরের পূজারী শ্রীশ্রীমায়ের সেই ভাবময় মূর্তি নয়নগোচর করে অভিভূত হলেন। দেবী-জ্ঞানে মাকে পূজা করলেন এবং ঐ মন্দিরেই থাকবার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। কণ্ঠে কণ্ঠে রটে গেল স্বয়ং ভগবতী। নারায়ণী। সীতা দেবী অবতীর্ণা হয়েছেন অযোধ্যা নগরীতে, কে দেখবে ছুটে এসো।

অসংখ্য ভক্ত সমাগম হলো। ভক্তরা মাকে জগজ্জননীরূপে পূজা ও আরতি করলেন। কাঙালিনী, পাগলিনী মা আজ আবার ঐশ্বর্যময়ী জগজ্জননী মূর্তিতে হয়ে উঠলেন উদ্ভাসিত ভক্তবৃন্দের সম্মুখে। প্রাণহরা মা সকলের প্রাণ হরণ করে নিলেন। সন্ধ্যা-বেলায় শ্রীরামচন্দ্রের আসনের পাশে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে বসিয়ে পূজারীরা পূজা ও আরতি করতে লাগলেন। সে এক অভাবনীয় অনির্বচনীয় দৃশ্য।

বিশ্বজননী আনন্দময়ী মাকে জানলো চিনলো অযোধ্যা নগরীর বাসিন্দারা।

আনন্দময়ীর অবস্থানে সরযূর তীর আনন্দধামে হলো রূপান্তরিত। আর সরযূ নদী হয়ে উঠলো শ্রীসৌন্দর্যসুধানদী। পরমানন্দ উপভোগ করতে লাগলো ভক্তবৃন্দ। আনন্দময়ীর সাহচর্যে এসে তাদের মন প্রাণ যেন বলে উঠলো—'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।'

অযোধ্যা থেকে মা এলেন লক্ষ্ণৌতে। লক্ষ্ণৌ থেকে এটোয়াতে। এটোয়ার সিভিল সার্জন শ্রীযুত পীতাম্বর পন্থ মায়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে মায়ের থাকবার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। তিন মাইল দূরে, যমুনা নদীর তীরে। দাউজীর মন্দিরের সন্নিকটে, একটি নূতন বাড়িতে। শ্রীশ্রীমা এই স্থানে প্রায় পঁচিশ দিন অবস্থান করলেন। মা গুপ্তভাবে ছিলেন। সর্বত্রই গুপ্তভাবে থাকবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু কোথা দিয়ে যেন কি হয়ে যায়! একে একে এসে উপস্থিত হয় ভক্তরা। তারপর গড়ে ওঠে ভক্তমণ্ডলী।

কানন-কুন্তলা পৃথিবী। শ্যামল শস্যাঢ্য প্রান্তর। দলিতাঞ্জন ঘননীল মেঘপুঞ্জ। কত গাছ, কত ফুল, কত রঙ, কত পাখী, কত ডাক, কত জল, কত সুর,—একটি অনবদ্য ছন্দ। অবিচ্যুত শৃঙ্খলা। তারই মাঝে মা আনন্দময়ী হলেন একটি প্রেম-প্রসন্ন রস-প্রকাশ। আনন্দময়ী, ব্রহ্মময়ী। তাই তো মা যেখানেই অবস্থান করেন সেই স্থানই হয়ে ওঠে তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ।

প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে যমুনা নদীর তীরে, শ্মশানের সন্নিকটে একটি অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় এসে বসেন শ্রীশ্রীমা। এখানেও গড়ে ওঠে ভক্তমণ্ডলী। ভক্তসমাগম হতে শুরু হলো।

প্রতাপগড়ের রাণীরা শ্রীশ্রীমায়ের আগমন সংবাদ জেনে, মাকে নিজেদের প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। তারপর জগজ্জননীরূপে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে ষোড়শোপচারে পূজা ও আরতি করলেন। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য।

* * *

অনেক যোগ, তপস্যা করেও মন স্থির করতে পারছি না। শান্তি পাচ্ছি না। শান্তির পথ বলে দিন।

বলছেন একজন সাধু। শ্রীশ্রীমাকে। বেরিলিতে। মা এটোয়া থেকে বেরিলিতে এসেছেন। উঠেছেন ধর্মশালায়। গুপ্তভাবে থাকতে পারলেন না। ভক্তিমতী পাঞ্জাবী মহিলা শ্রীমতী মহারতন, মায়ের পূর্ব-পরিচিতা। শ্রীশ্রীমায়ের আগমন সংবাদ জেনে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন ধর্মশালায়। আরও অনেকে এসে উপস্থিত হলেন। ধর্মশালা পরিণত হলো তীর্থক্ষেত্রে।

সাধুজীও জগজ্জননীর আগমন সংবাদ জেনে ছুটে এসেছেন মাতৃদেবীর দর্শনে। মা'র শ্রীচরণকমলে নিবেদন করলেন এই মানসিক চঞ্চলতার বিষয়টি।

মা সমস্যার সমাধান করে দিলেন। গোপনে কিছু উপদেশ দিয়ে বললেন,—'প্রথম বীজটি পুঁতে যদি বারে বারে উঠিয়ে দেখা যায়, তবে সেই বীজে আর গাছ বের হয় না। বীজটি মাটির ভিতর পুঁতে যত্নে রক্ষা করতে হয়। জল সেচন করতে হয়। শেষে গাছ বের হয়ে বড় হয়ে গেলে, সেই গাছ হতেই আবার কত বীজ হয়। স্বাভাবিক ভাবেই কত ফুল ফল ঝরে পড়ে।'

সাধুজী মায়ের উপদেশ লাভে অপার আনন্দ অনুভব করলেন মনে মনে।

ভক্তিমতী স্ত্রী-ভক্তরা কীর্তন শুরু করলেন। কৃষ্ণকীর্তন। নাম-গান। মা ভাবস্থ হয়ে অপরূপ মাতৃমূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন ভক্তবৃন্দের সম্মুখে। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য।

বেরিলিতে নয় দিন অবস্থান করে, ভক্ত কৃষ্ণরাম পন্থের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মা এসে পৌঁছুলেন নৈনিতালে। এসে উঠলেন নয়না দেবীর মন্দিরে। এখানেও হলো ভক্ত সমাগম। কৃষ্ণরাম পন্থ ও অন্যান্য ভক্তরা পুষ্প-চন্দন-ফলাদি দিয়ে শ্রীশ্রীমাকে দেবী ভগবতীরূপে পূজা করলেন, দুর্গাপূজার নবরাত্রিতে।

নৈনিতাল থেকে বেরিলি হয়ে মহাষ্টমী ও মহানবমীর দিন শ্রীশ্রীমা এসে উপস্থিত হলেন আগ্রাতে। এখানেও মা গুপ্তভাবে অবস্থান করতে পারলেন না। ভক্ত শ্রীযুত বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তপ্রবর ডাঃ ভার্গব ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ মহাষ্টমী ও মহানবমীর দিন শ্রীশ্রীমাকে পুষ্প-চন্দন দিয়ে মহাদেবীরূপে পূজা করলেন।

আগ্রা থেকে 'মা' এলেন লাহোরে। সেখান থেকে অমৃতসর, মিরাট ও গড়মুক্তেশ্বর হয়ে মা এলেন দেওঘরে। আরও বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে ১০ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার মা এসে উপস্থিত হলেন সেই বহুবিখ্যাত তারাপীঠে। তারাপীঠের মহাশ্মশানে। কালীমায়ের মন্দিরে

চৌত্রিশ

শ্রীশ্রীমা এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

দক্ষিণেশ্বর। বাংলার তপোবন। সারদার পীঠস্থান। জ্ঞান ও তপস্যার প্রাণকেন্দ্র।

এই স্থানেই তপস্যাভাস্বর রামকৃষ্ণ 'অমৃতস্য পুত্রঃ'—অভীঃ মন্ত্র এবং আত্মার ঐশ্বর্য লাভ করেন। এই তীর্থে সাধক রামকৃষ্ণের তপঃশক্তিতে অসাধ্য হয়েছে সুসাধ্য। দুর্লভ হয়েছে সুলভ। দুর্জয় হয়েছে সুজেয়। 'সম্ভবামি যুগে যুগে' বাণী সার্থক করতে কালী-সাধক রামকৃষ্ণ এই পুণ্যতীর্থে অবতীর্ণ হয়ে মাটির মানুষের সঙ্গে করেছেন লীলা।

মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধক রামকৃষ্ণের নরদেহ ছিল মহাকালীর লীলাক্ষেত্র। তাঁর নিত্যশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল দেহ-মনকে কেন্দ্র করে কত বিচিত্র লীলাই না হয়েছে প্রকটিত—এই মহান তীর্থভূমিতে।

শতবর্ষ পূর্বে দেহ-আত্মার মিলন-সাধনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল কোলাহল-মুখর নগর হতে দূরে সভ্যজগতের অপরিজ্ঞাত দুরধিগম্য স্থানে,—বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্যে, মাধুর্যে ও ঐশ্বর্যে প্রকৃতির নয়নাভি-রাম—বাংলার তপোবন, লীলাভূমি এই দক্ষিণেশ্বরে।

যুগে যুগে শক্তি সাধনার তপস্যা করেছে এই বাংলা দেশ। যেখানে তপস্যাবলে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির দেহ ও আত্মার হয়েছে পুনর্মিলন। এরই সাগরতীর্থে রাজা ভগীরথের তপস্যাশক্তিতে শঙ্করের শিরোবন্দিনী সুরধুনী অবতরণ করে কত সহস্র অভিশপ্ত আত্মার করেছিলেন উদ্ধার। আর এই সুরধুনীকে অবলম্বন করেই শত শত জনপদ হয়েছে সুজলা সুফলা, কূলে কূলে অগণিত তীর্থ হয়েছে রচিত;—কত শত মঠ মন্দির হয়েছে নির্মিত। শতবর্ষ

পরে সেই সুরধুনীর পশ্চিম কূলে দক্ষিণেশ্বরে করুণাময়ী মাতৃমূর্তিতে জগজ্জননী হলেন আবির্ভূতা। মন্দিরের মৃন্ময়ী মূর্তি—চিন্ময়ী শক্তিতে হয়ে উঠলেন উদ্ভাসিত। বিশ্বজননী ভক্তবৃন্দকে দর্শন দিলেন আনন্দময়ী মূর্তিতে। আবার শুরু হলো ভক্ত ও ভগবানের লীলা,—লীলায় ছাওয়া এই দক্ষিণেশ্বরে।

লীলাময়ী মা আনন্দময়ী গঙ্গার বক্ষে ভক্তসনে চলেছেন। ভক্তেরা খোল করতালসহ কীর্তন শুরু করেছেন। আনন্দকীর্তন। আনন্দময়ীর আনন্দ আর ধরে না—আনন্দদায়িনী মা আনন্দ বিতরণ করে চলেছেন ভক্তবৃন্দসনে।

অবশেষে বেলা প্রায় সাড়ে এগারটায় দক্ষিণেশ্বর ঘাটে নৌকা লাগলো। শ্রীশ্রীমা উপরে উঠে গেলেন। নরম মাটির বুকে রেখে গেলেন পদযুগলের ছাপ। ভক্তেরা মায়ের পদচিহ্ন হাত দিয়ে পরম ভক্তিভরে মাথায় ও বুকে স্পর্শ করলেন।

শ্রীশ্রীমা মনোরম ভাগীরথী তীরে বিহগকূজিত পঞ্চবটি-শোভিত উদ্যান ও সুবিশাল দেবালয়ের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। গঙ্গার পূত বাষ্পকণাপূর্ণ পবন মাতৃ-অঙ্গ স্পর্শ করতে লাগলো। লীলাময়ী মা ভাব-বিহ্বল হলেন। শৈলসুতা ভাগীরথীর ভাব। অকস্মাৎ দ্রুতপদে এসে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মা আনন্দময়ী মহানন্দে অবগাহন করতে লাগলেন গঙ্গায়। ভক্তবৃন্দও মাকে অনুসরণ করে গঙ্গায় অবতরণ করলেন। লীলাময়ী মা গঙ্গাবক্ষে ভক্তবৃন্দসহ লীলা করতে লাগলেন।

অবশেষে এসে বসলেন নাটমন্দিরে। মা আনন্দময়ী তো নয়, যেন শ্রীশ্রীজগদম্বা অধিষ্ঠিতা হয়েছেন নাটমন্দিরে। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। ভক্তেরাও স্নান করে পবিত্র হয়ে মাকে ঘিরে বসলেন। কীর্তন হলো শুরু—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

*   *   *

এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার
মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে
বসত করি।

কীর্তন অবিরাম চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে ভক্তরা ভোগের আয়োজন করলেন। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর ভোগ হলো। জগজ্জননীর ভোগ। মানবী মূর্তিতে কালীমায়ের ভোগ। মহা-মহোৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন ভক্তরা। শতবর্ষ পরে মহামহোৎসবের আনন্দে আবার নেচে উঠলো পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বর—শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আগমনে।

দিবাবসানে শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরের লীলা সাঙ্গ করে ফিরে চললেন কলকাতার পথে।

সেদিন ছিল শুক্লাদশমী। জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জনের দিন। গঙ্গাবক্ষে ভেসে চলেছেন মা আনন্দময়ী ভক্তবৃন্দসনে। কীর্তন শুরু হয়েছে। গঙ্গার মলয় বাতাস বয়ে নিয়ে চলেছে কীর্তনের সুমধুর স্বর-

মেরে তো গিরিধারী গোপাল
দুসরো ন কোই।

পঁয়ত্রিশ

ধর্ম মানে কি ?

যে ধারণ করছে। চোর চুরিবিদ্যা ধরেছে। কিন্তু আবার দেখা যায় সেই চোরই সাধু হয়ে যায়। তবেই চুরিটা তার স্বধর্ম নয়। যা বাস্তবিক ধর্ম তার কখনও পরিবর্তন হয় না। যা পরিবর্তন হয় তা ধর্ম নয়। অধর্ম। তোমার স্বভাব হচ্ছে ধর্ম। তা ছেড়ে অপর সব ধর্ম (অধর্ম) নেওয়া সর্বদাই তোমার পক্ষে ক্ষতিকর। আবার

দেখ জগতে যেমন আগুনের ধর্ম। জলের ধর্ম। সেইরূপ সংস্কার অনুযায়ী যার যার যে স্বভাবটি প্রকাশ থাকে, গুরু শক্তি দ্বারা তার ভিতর দিয়েও তদভিমুখী করিয়ে নেন।

মা বলছেন ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারীকে। সীতাকুণ্ডে। শঙ্করমঠে। সীতাকুণ্ডে এসে মা এই শঙ্করমঠে উঠেছেন। পাহাড়ের উপর অতি মনোরম স্থান।

ভোলাগিরি আশ্রমের ব্রহ্মচারীটি শ্রীশ্রীমায়ের আগমন-সংবাদ শুনে মাকে দর্শন করতে এসেছেন। জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ হন এবং নিজ মনের সংশয় দূর করবার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করেন। মা কাব্যায়িত করে তৃপ্তিকর ভাষায় তার উত্তর দিচ্ছেন।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যার তাৎপর্য সম্বন্ধে মা বলছেন—অনেক দিন পূর্বে রমনার কালীবাড়ি হতে যেতে তিনটি গৈরিক বেশধারিণীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার মধ্যে একজন হঠাৎ আমাকে ডেকে নানা কথা প্রসঙ্গে বললো, 'দেখুন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।' তখন আমি বললাম, জগৎ মিথ্যা কি করে বলি। জগতের ভিতরই তো সকলের জন্ম। জন্মিয়াই এই জগৎ দেখছো। বাস্তবিক যখন সেই জ্ঞান হবে তখন বলা চলে জগৎ মিথ্যা। এই কথায় তিন সন্ন্যাসিনীর ভিতর ঝগড়া লাগলো,—'এক সাদা কাপড় পরা ঘোমটা দেওয়া স্ত্রীলোকের কাছে আবার কি কথা বলতে গিয়েছিলে?' ইত্যাদি। এবারে মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন—হাস্যের উচ্ছলতায় বিষয়টি রস ও রহস্যে ভরপুর হয়ে উঠলো।

মা আবার বলছেন, 'জগতের যে গতাগতি, তারও আদি অন্ত নাই, সেই হিসাবে জগৎও সত্য। আর এক কথা যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবিক তত্ত্ব না বুঝা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত জগৎও সত্য মেনে নিতে হবে।'

জ্যোৎস্না রাত্রি। পূর্ণিমা—নিশীথিনীর অবর্ণনীয় জ্যোৎস্না। সেই

জ্যোৎস্না-ভরা আকাশতলে ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে ঘিরে বসে শুনছেন শ্রীমুখের অমৃতনিষ্যন্দিনী বাণী।

'বই পড়া বিদ্যা—যেমন টাইম টেবল দেখে রাস্তা চলা। টাইম টেবলে যা থাকে তা ছাড়া রাস্তায় আরও কত কি আছে। যা বিশেষ, যতটা প্রকাশ করতে পেরেছে তাই আছে টাইম টেবল-এ, —তা ধরে ধরে সেই রাস্তায় চললে দেখা যায় আরও কত কি দেখবার ও জানবার বিষয় আছে। টাইম টেবলে কি আর সব লিখতে পারে? যারা সেই পথে চলে তারা বুঝতে পারে যে শাস্ত্রে যা লেখা আছে তা সত্য, তা ছাড়া আরও কত কি বিষয় আছে। শাস্ত্রে আর কতটুকু লিখতে পারে? প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও কত কি দেখেন জানেন। তবে যেমন টাইম টেবল দেখেই ট্রেনের পথ চলতে হয়, সেইরূপ শাস্ত্র উপদেশ মতই প্রথম প্রথম চলতে হয়। শাস্ত্রীয় কথার ভিতরেও অনন্ত ভাব নিহিত থাকে কিন্তু।'

'খণ্ড আনন্দে প্রাণটা তৃপ্ত হচ্ছে না তাই মানুষ অখণ্ড আনন্দ পাবার জন্য অখণ্ডের সন্ধান করছে। শান্তি ও আনন্দ সকলেই চায়। আবার এই জাগতিক শান্তি ও আনন্দে মানুষ তৃপ্ত হচ্ছে না, পূর্ণ শান্তি ও আনন্দের খোঁজ করছে। তবেই বুঝতে হবে সেই পূর্ণ আনন্দের অনুভব তার আছে, তাই তো মানুষ এই খণ্ড আনন্দে তৃপ্ত হচ্ছে না। সেই জন্যই সাধনার দরকার। বাস্তবিকই সাধন ভজন করতে করতে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন মানুষ বুঝতে পারে আমার কিছুই ক্ষমতা নাই, তিনি যেমন করাচ্ছেন আমি তেমনই করছি।

কিন্তু সে অনুভূতি কোথায়?

বাস্তবিক এই অনুভূতি হলে দুঃখ কষ্ট কিছুই করবার নাই।

তোমরা যে অহংবুদ্ধি দ্বারা লেখাপড়া কাজকর্ম সব কিছু করছো, সেইরূপ ঐদিকে যাবার জন্য একটু একটু চেষ্টা করো। সব আমরা

করতে পারি—আর ধর্ম কাজের কথা হলেই তিনি না করাইলে কি করিয়া করিব ?—এ কথা বলা চলে না।'

শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ এসেছেন শম্ভুনাথের মন্দিরে। পাণ্ডারা আনন্দময়ী মায়ের জ্যোতির্ময় মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ হলেন। সন্ধ্যাবেলা শম্ভুনাথের আরতির পর ভাবে বিভোর হয়ে তাঁরা আনন্দময়ী মাকেও দেবীরূপে আরতি করলেন।

অবশেষে শ্রীশ্রীমা সুমিষ্ট কণ্ঠে গান ধরলেন—

জয় শিব শঙ্কর, বম্ বম্ হর হর—

নির্জন পাহাড়। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। একটানা অনুচ্চ শৈলমালা। তাদের ঢালুতে পলাশের জঙ্গল। উপরের দিকে বনগুল্ম ও বড় বড় ঘাস। জ্যোৎস্না ফুট ফুট করছে। গাছের ছায়া হ্রস্বতম হয়ে উঠেছে। বন্য ফুলের সুবাসে জ্যোৎস্না-শুভ্র প্রান্তর ভরপূর। এমনই এক অভিনব প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে বাতাস বয়ে নিয়ে চলেছে মাতৃকণ্ঠের সঙ্গীতের সুমধুর স্বর,—দূরে—দূরান্তে। ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে নীরবে পান করছেন সেই মাতৃকণ্ঠ-নিঃসৃত অমৃত-সুধা।

তারপর অধিক রাত্রে সেই মুক্ত জ্যোৎস্না-শুভ্র বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে ভক্তরা মাকে নিয়ে নামগান করতে করতে ফিরলো শঙ্করমঠে।

এইভাবে সীতাকুণ্ডের লীলা সাঙ্গ করে লীলাময়ী মা চলে এলেন চট্টগ্রামে। উঠলেন এসে কালীবাড়িতে। বহু ভক্তের সমাগম হলো। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মাকে ঘিরে বসলেন। কীর্তন হলো শুরু।

—মুড়াব মাথার কেশ, ধরিব যোগিনী বেশ

*　　*　　*

যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেথায় নিঠুর হরি॥

১০　কীর্তনে মা'র হলো ভাব। ভাব-বিহ্বলতা। ভাব-সমাধি। মা

অপরূপ রূপে প্রতিভাত হলেন ভক্তবৃন্দের সম্মুখে। ভক্তরা অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করলেন শ্রীশ্রীমায়ের জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে।

মা বললেন, 'শুধু নাম, আমি জানি নামেই সব হয়। যত বেশী সময় পার তাঁর জন্য দাও। নাম বেশী না নিতে পারো তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা কর নতুবা নাম-সংকীর্তন বা সৎ-পুস্তকাদি পাঠ কর। যে করেই হোক তাঁর দিকে মনটা রাখতে চেষ্টা করো।

আসল কথা কাজ চাই। কাজ কর। সময় দাও। বাস্তবিক তাঁকে চাও—দেখবে সব ঠিক মিলে যাবে। কারণ তিনি যে স্বয়ংপ্রকাশ।'

একজন ভক্ত বললেন,—'তাঁর কৃপা হইলে চাইতে পারিব।'

মা প্রত্যুত্তর বললেন, 'এই যে তিনি বলছো, এখনও তাঁর সাথে পরিচয় হয় নাই। শুধু মুখেই বল 'তাঁর ইচ্ছা'। তোমরা পড়াশুনা করে পাস কর, কত কাজকর্ম কর, এই যে তোমাদের শক্তি আছে বলে মনে কর,—ইহা দ্বারাই তাঁকে একটু ডাক। সেই সময় তাঁর ইচ্ছা বলে বসে থাকলে চলবে কেন? তাঁর ইচ্ছা না হলে কিছুই হয় না সত্য। বাস্তবিক বলবার আমরা অধিকারী নই।'

অধিক রাত্রেই মা বিশ্রাম নিলেন।

চট্টগ্রাম শহর থেকে মা এলেন ভক্তপ্রবর জ্যোতিষচন্দ্রের পিতৃভূমি পরৈকোড়ায়। বেলা চারটার সময় ভক্তবৃন্দসহ মা এসে পৌঁছালেন। ঘাট হতে গ্রামবাসীরা কীর্তন করতে করতে শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে সঙ্গে চললেন। নগরকীর্তন। এ যেন স্বয়ং গৌরাঙ্গসুন্দর রাধাভাবে বিভোর হয়ে জীবের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম বিলিয়ে চলেছেন। শ্রীশ্রীমা কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ভক্ত জ্যোতিষ-চন্দ্রের গৃহে পদার্পণ করলেন। মাধব ও মনসা মন্দিরের মধ্যস্থিত ঘরখানিতে এসে মা উঠলেন। কীর্তন বন্ধ হলো না। অবিরাম চলতে লাগলো। নামগান। কৃষ্ণ গুণগান। কীর্তনিয়া জ্যোতিষ রুদ্রও এসেছেন। কীর্তনে মেতেছেন। মহানন্দে কীর্তন করছেন।

অবশেষে মাকে ঘিরে কীর্তন হলো শুরু। ভক্তরা ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে করতে কীর্তন করতে লাগলেন।

—'জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে'।

মা বসে বসে দুলে দুলে ভাবে বিভোর হয়ে নামগান করছেন। শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কীর্তনে মেতেছেন। সে এক অভাবনীয় অনির্বচনীয় দৃশ্য।

অবশেষে শ্রীশ্রীমা'র ভোগ হলো।

ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হলেন।

শ্রীশ্রীমা'র অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে সকলেই তৃপ্ত। পরমানন্দ অনুভব করছেন সকলে মনে মনে।

মেয়েরা বলছেন, 'কি করবো, ঘরে যে থাকতে পারছি না, তাই ছুটে আসি।'

পুরুষরা বলছেন, 'এমন মূর্তি আর দেখি নাই। অনেক সাধুরা ঔষধপত্র দেয়—তাই সাধুর কাছে কত লোক আসে। আর ইনি তো কিছুই দেন না। তবুও শুধু হাসি ও কথায় এমন মিষ্টত্ব যে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না।'

দলে দলে লোক আসছে। লোকে লোকারণ্য। নামগানও অবিরাম চলছে। শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানে ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের গৃহ যেন মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে। গৃহ নয় তো মন্দির। কালী—মহাকালীর মন্দির। ভক্ত-মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য স্বয়ং দেবী ভগবতী যেন অবতীর্ণা হয়েছেন ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের গৃহে। গৃহমন্দিরে। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য।

*　　*　　*

অষ্টমী তিথি।

শ্রীশ্রীমা এলেন কক্সবাজারে।

সমুদ্রের ধারে তাঁবু খাটিয়ে ভক্তরা মায়ের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন।

সামনেই সাগর।

তার অসীমতা হারিয়ে গেছে দিগন্তে। মাথার উপর মেঘশূন্য নীলাকাশ। ঘনশ্যাম সাগরতরঙ্গ আছড়ে পড়ছে শ্রীরাধারাণীর চরণ-কমলে। জলের ছল-ছলানির শব্দ নয়—এ যেন সজল জলদাঙ্গ মুরলীধর শ্যামসুন্দরের বাঁশী মর্মান্তিক সুরে আহ্বান করে চলেছে শ্রীরাধারাণীকে। সেই ব্রজরমণের বংশীধ্বনিতে মোহিত হয়ে তাঁবুর চারপাশের চঞ্চল ছায়াগুলিও শুরু করে দিয়েছে নৃত্য।

সমুদ্রতীরের এই অপূর্ব মোহনীয় রাত্রে ভক্তরা শ্রীশ্রীমা আনন্দ-ময়ীকে ঘিরে কীর্তন শুরু করে দিলেন।

—নবঘন শ্যাম মূরতি মনোহর হামারি হিয়াপর জাগে ;
শ্রুতিমূলে চঞ্চল কুণ্ডল মণিময় পীতবাস দোলে পিঠভাগে।

মা ভাবস্থ হলেন। ভাব-বিহ্বল। ভাব-সমাধি। শ্রীশ্রীমায়ের অপরূপ জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ হলেন কক্সবাজারের ভক্তরা।

কক্সবাজার প্লাবিত হয়ে উঠলো। মা আনন্দময়ীর আগমনে। ঘরে ঘরে কীর্তন। নামগান। মহা-মহোৎসব হতে লাগলো।

মা জীবের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম বিলি করে চলেছেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ভাব।

মা বলছেন, 'ভগবান সকল শাস্ত্রের ধ্যান-ধারণার অতীত। শাস্ত্রকাররা সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত পুরুষের তত্ত্ব কতটুকুই বা অনুধাবন করতে পারেন? মানুষের দৃষ্টির সীমা সীমাবদ্ধ—কিন্তু ভগবান অসীম। অনন্ত। বিরাট। দৃষ্টির অগম্য।'

কক্সবাজার থেকে মায়ের যাত্রা হলো শুরু রামকূটের পথে।

রামকূট। রামকূট পাহাড়।

ভক্তবৃন্দসহ মা চলেছেন সাম্পানে। ৫।৬ ঘণ্টা চলার পর ষড়ঙ্গ নৌকায় (সুদীর্ঘ ডিঙি নৌকা) করে শ্রীশ্রীমা চললেন।

ভাবে বিভোর হয়ে মা সুমিষ্ট কণ্ঠে গান ধরেছেন, 'খেয়াঘাটের পাটনী এসেছে'—

স্থান কাল কণ্ঠের মধুমিলনে সঙ্গীতের সুমধুর স্বরে মোহিত হলেন ভক্তবৃন্দ। সন্ধ্যায় এসে মা পৌঁছুলেন রামকূট পাহাড়ে। স্থানীয় জমিদার ঈশান পালের পুত্র শ্রীযুত নগেন্দ্র পাল স্বয়ং উপস্থিত হয়ে মাকে নিয়ে গেলেন নিজ আলয়ে।

রামকূট পাহাড়। ছোট্ট। মনোরম স্থান। এখানে আছে, বুদ্ধ, শিব ও রামসীতার মন্দির। পুরি সম্প্রদায়ের একজন সাধু এসব করেছেন। তিনি অসুস্থ। মা সাধুকে দেখতে তাঁর কুটিরে গেলেন। সাধুটি জ্যোতির্ময় মাতৃমূর্তি দর্শন করে আনন্দে বিহ্বল হলেন। মায়ের সঙ্গ ছাড়তে পাচ্ছেন না। বললেন—'আজই যাওয়া কি ভাল হবে ?'

মা মৃদু হেসে প্রত্যুত্তরে বললেন,—আসা যাওয়া কি আর ভাল হবে ? সাধুটি শ্রীশ্রীমায়ের তৃপ্তিকর ভাষা আর মনোমোহিনী রূপ নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন এবং জগজ্জননী রূপে মাকে প্রণাম করলেন।

ইতিমধ্যে দূর গ্রাম থেকে এক কীর্তনের দল এসে উপস্থিত হলো। শ্রীশ্রীমাকে প্রদক্ষিণ করে তারা কীর্তন করতে লাগলো।

প্রাণ গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকরে।
নিতাইর সমান দয়াল আর নাই রে ॥

শ্রীশ্রীমাও ভাবে বিভোর হয়ে মহানন্দে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করতে লাগলেন। অবিরাম চললো নামগান।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব হলো মা'র দেহে। মনে। কীর্তনানন্দে মত্ত হয়ে রইলেন বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

নিশীথ রাত্রিতে রামকূটের পথে পথে চললো নামকীর্তন। অবশেষে মধ্যরাত্রিতে মা ভক্তবৃন্দসহ এসে উঠলেন বিষ্ণুমন্দিরে।

পরদিন প্রভাতে লীলাময়ী মা রামকূটের লীলা সাঙ্গ করে এসে পেঁাছুলেন কক্সবাজারে।

আবার মাতৃনামে প্লাবিত হয়ে উঠলো কক্সবাজার। জ্যোৎস্নাশুভ্র রাত্রিতে সমুদ্রকূল মাতৃনাম সুধায় মুখর হয়ে উঠলো। জ্যোৎস্না-পুলকিতা রজনী। স্বচ্ছ নীলাকাশ। সমুদ্র অজস্র রজতধারা বুকে মেখে আনন্দে নৃত্য করছেন। মনে হয় এমনই আর এক মধু-যামিনীতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সমুদ্রকূলে 'প্রতিপদং পূর্ণামৃত স্বাদনং'—রসধারা ভারতভূমিতে অজস্র সিঞ্চন করেছিলেন। আর তারই ফলে দেশ শ্যাম শোভায় কি অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছিল। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ মা আনন্দময়ী আবার সেই বেলাভূমিতে ছড়াচ্ছেন নামবীজ। উষর ভূমিতে এর ফল কত গভীর কত সুদূরপ্রসারী হবে কে বলতে পারে।

মাকে প্রদক্ষিণ করে ভক্তরা গাইছেন,

মা মা মা মা মা মা মা
ভজ মা মা মা মা মা মা
জপ মা মা মা মা মা মা
ডাক মা মা মা মা মা মা
ডাক বল গাও ভজ জপ মা মা মা ॥

* * *

'তোমরা যে মালিক হয়ে বস তাই দুঃখ পাও। মালিক না হয়ে মালী হও। তবেই আর দুঃখ থাকবে না।'

শ্রীশ্রীমা বলছেন স্ত্রী-ভক্তদের। সমুদ্রকূলে। তাঁবুতে বসে। আজ আর মা সমুদ্রের তীরে গেলেন না। তাঁবুতে বসেই ভক্ত-সঙ্গ করছেন। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করলেন।

'এক সাধু জঙ্গলে থেকে তপস্যা করেন। হঠাৎ একটি লোকের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হলো। সে গিয়ে সাধুর চরণে আশ্রয় নিলো। সাধুটি এক ছটাক চালের ভাত খান। তাই তিনি ভিক্ষা করেন আর সারাদিন তপস্যা করেন। কিন্তু এই লোকটি আশ্রয় নেওয়ায় তাঁর চিন্তা হলো যে এ আবার এক ছটাকের উপর ভাগ বসাবে। কিন্তু

আশ্রিত লোকটি খাওয়ার কথা সাধুটিকে কিছুই বললো না। সাধুটি যখন চাল ধুয়ে জল ফেলছেন তখন সে অঞ্জলি ভরে সেই জল পান করলো। তাতেই সে তৃপ্ত হয়ে সাধুটির সেবা করতে লাগলো। সাধুটি আশ্চর্য হলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। কয়েকদিন পর আবার আর একজন এসে সাধুর কুটিরে আশ্রয় নিলো। সাধুটি ভাবলেন, একজন তো জল খেয়ে আছে, এটি নিশ্চয়ই ভাতে ভাগ বসাবে। কিন্তু সেও কিছুই করলো না। সাধুটি যখন ভাতের ফ্যান কাটছেন তখন লোকটি তাই রেখে দিলো এবং তাই দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে সাধুর চরণ সেবা করতে লাগলো।

এতক্ষণে সাধুটির চৈতন্য হলো। ভুল ভেঙে গেল। তিনি বুঝলেন ভগবানই সব ব্যবস্থা করেন। যখন যাকে যে কাজে পাঠান তাকে তদুপযোগী বুদ্ধি ও শক্তি তিনিই দিয়ে দেন। কেহ কাহাকেও কিছু করে না।

সাধুটি জ্ঞানলাভ করলেন এবং ঐ আশ্রিত দুইজনকে নিয়ে আরও গভীর জঙ্গলে তপস্যা করতে চলে গেলেন। আর দিবানিশি প্রাণভরে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন।'

গল্প শেষে আবার শুরু হলো কীর্তন।

ভজ গোবিন্দ, কহ গোবিন্দ, লহ গোবিন্দের
নাম রে—
যে জন গোবিন্দ ভজে সেই আমার
প্রাণ রে—

* * *

—মম মন্দিরে নাচে গিরিধারী, কিবা নব নব ছন্দে।
সোনার নূপুর রুনু ঝুনু বাজে, তালে তালে মৃদু মন্দে॥

এইভাবে লীলাময়ী মা কক্সবাজারের লীলা সাঙ্গ করে চাঁদপুর হয়ে চলে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় এসে উঠলেন বিড়লা পার্কের শিবমন্দিরে। মা'র নির্দেশে ভক্তদের সংবাদ দেওয়া হলো না। মা অজ্ঞাতভাবে থাকবার

চেষ্টা করলেন। প্রচ্ছন্নভাবে গৃহে গৃহে—'জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ'—নামকীর্তন করতে লাগলেন। এ যেন স্বয়ং গৌরাঙ্গসুন্দর জীবের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম বিলিয়ে চলেছেন।

মন্দিরে বসে বসেই মা সুমিষ্ট কণ্ঠে গান ধরলেন,

জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম
হরে হরে ॥
ঐ নাম বল বদনে শুনাও কানে
বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে ॥

মা আর প্রচ্ছন্ন থাকলেন না। ভক্ত চিনলো ভগবানকে। ভক্ত ও ভগবানের লীলা হলো শুরু বিড়লা পার্কের শিবমন্দিরে। লোকে লোকারণ্য। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে দর্শন ও চরণকমল স্পর্শের জন্য ভক্তদের আকুলতা। যেন স্বয়ং ভগবতী মানবীরূপে আবির্ভূতা হয়েছেন কলকাতার বিড়লা পার্কে। শিবমন্দিরে। ভক্তরাও শ্রীশ্রীমায়ের জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে ভাবে বিহ্বল হলেন। ভাবে বিভোর হয়ে তাঁরাও কীর্তন শুরু করে দিলেন। নামগান। কৃষ্ণ গুণগান। শিশু, বৃদ্ধ, মেয়ে, পুরুষ সকলেই মেতেছেন কীর্তনে। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য।

এই বিড়লা পার্কেই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে দর্শন করে রামতারণবাবু (Advocate) লিখেছিলেন গুরুপ্রিয়া দেবীকে। রামতারণবাবু শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করেই মায়ের ভক্ত হয়ে পড়েন।

'বিড়লার মন্দিরে আমি দূরে দাঁড়াইয়া মা'র মূর্তি দেখিতাম। নিরাভরণা, কিন্তু মা আমার কি সৌন্দর্যই না ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে কত স্ত্রীলোক কত সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু মা'র রূপের কাছে তাহাদের যেন মলিন দেখাইত। আর মা'র হাসিটুকু, কখনও মৃদু, কখনও উচ্চ। কি মধুর সেই হাসি! আজিও তাহা চিন্তা করিতে করিতে সব ভুলিয়া যাই।'

লীলাময়ী মা কোথাও স্থির হয়ে বসেন না। আবার কলকাতা পরিত্যাগ করলেন। বিড়লা পার্কের আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে অকস্মাৎ চলে এলেন কাশীতে। বারাণসী ধামে।

এ বিষয়ে মা বলেন, 'এক জায়গায় বসিয়া থাকিলেও তোমরা বলিবে এক জায়গায় বসিয়া থাকেন কেন? আর সত্য কথা বলিতে কি আমার কিন্তু একটুও মনে হয় না যে আমি ঘুরিতেছি। এক বাসার ভিতরেই যেন এঘর ওঘর করিতেছি অথবা এক জায়গায়ই বসিয়া আছি।'

আবার প্লাবিত হয়ে উঠলো বারাণসী ধাম। শিবের লীলাক্ষেত্র। মা আনন্দময়ীর আগমনে। ভক্তরা অহোরাত্র কীর্তন শুরু করে দিলো। কৃষ্ণকীর্তন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

এখানে মা দর্শন দিলেন শ্রীযুত মহেশ ভট্টাচার্য মহাশয়কে। বাংলাদেশের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবসায়ী এবং গ্রন্থ-প্রণেতা। তিনি অসুস্থ। মা আশ্বাস দিলেন মহেশবাবুকে। মহেশবাবু ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন,—মা, বড় কষ্ট আর পারি না, এখন সাহতে পারিতেছি না।

মা বললেন,—তুমি চিন্তা করিও না। শুধু তাঁকে ডাক। পরিবর্তন ত হইয়াই যাইতেছে। চিন্তা কি?

শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ অনুযায়ী মহেশবাবু এক বৎসর যাবৎ নিয়ম পালন করছেন। আজ এক বৎসর পূর্ণ হলো তাই মায়ের এই আশ্বাস বাণী।

মা বলেন, সংসারে শান্তি পাওয়ার আশাও ভুল, ক্ষণিক একটু আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে মাত্র।

তোমরা নাম কর। আর সেই আনন্দ পাও। আমার কথা বিশ্বাস কর। নাম কর। নিশ্চয় ফল পাইবে।

—তুমি তো ডাক্তারী কর, এবার একটু মনের ডাক্তারীটা কর।

শ্রীশ্রীমা বলছেন ডাঃ জে. কে. সেনকে। দিল্লীতে। ১৩৪৩ সন। চৈত্র মাস। দোলপূর্ণিমা। মা কাশী থেকে দিল্লীতে পদার্পণ করেছেন।

ভক্তপ্রবর সেনমহাশয় ভাবানন্দময়ী মাকে নিয়ে এসেছেন নিজ আলয়ে। বহু ভক্তের সমাবেশ হয়েছে—পঞ্চুবাবু, দুর্গাদাসবাবু, হারাণবাবু, চারুবাবু, পঙ্কজবাবু ও আরও স্ত্রী-পুরুষ ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে শ্রীমুখের অমৃত-নিষ্যন্দিনী বাণী শুনছেন।

মা আবার বলছেন ডাঃ সেনকে—'নাম কর। নামেই সব। তোমরা তো জান রোগ ভাল না হওয়া পর্যন্ত ঔষধপথ্য ঠিক ঠিক ভাবে খাওয়ান দরকার। সেই রকম নিয়মমত তাঁর নাম করে যাও। ফল পাইবেই।'

মা এসে উঠেছেন ডাঃ সেনের গাছঘরে। তাই মৃদু হেসে বলছেন, ডাঃ সেনকে—'তুমি অন্ততঃ কিছু সময় এই গাছঘরে গাছ হয়ে বসে থেকো।' সেই ধ্যানে বসিও। তারপর একান্তে বসে ডাঃ সেনের স্ত্রীর সঙ্গেও অনেক কথা বললেন। ডাঃ সেনের স্ত্রীও মায়ের সঙ্গে কথা বলে তৃপ্ত হলেন।

ভক্ত হারাণবাবু বলছেন, 'মা, তুমি প্রায় এক বছর পর আসিলে। আমাদের ত কিছুই হইল না। নামে দেখিতেছি কিছুই হয় না। এত কীর্তন করি, নাম করি—যখন করি তখন আনন্দ পাই। কিন্তু আবার ঘরে গেলেই যেই সেই।'

মা মৃদু হেসে রসিকতা করে বললেন, 'দেখ, চট্টগ্রামে টককে খেড়ে বলে। তোমরা ঔষধও খাও আবার খেড়েও খাও, তাই ফল পাও না।'

এত সুন্দর উপমাসহ উত্তরটি শুনে ভক্তরা হাসতে লাগলেন। মাও হাসতে লাগলেন। হাসির উচ্ছলতায় আনন্দময় হয়ে উঠলো গৃহাভ্যন্তর।

অবশেষে মা ফিরে এলেন পঞ্চুবাবুর বাসায়। তাঁবুতে। বহু ভক্তের সমাগম হয়েছে। লোকে লোকারণ্য। ভাবানন্দময়ী মাকে দর্শন করে ভক্তরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে কীর্তন শুরু করে দিলেন। "কে রে যমুনার তীরে বাঁশরী বাজায় ও তার ইন্দ্রনীলমণি রূপ দেখে যাবি আয়।"

* * *

"সখি, কহ না গৌর কথা ; গৌর নাম অমিয় ধাম, পীরিতি মূরতি দাতা।" শান্ত শ্রীসম্পন্না মহিমময়ী মা আনন্দময়ীও ভাবানন্দে বিভোর হয়ে অপরূপ জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ধারণ করলেন।

এই স্থানেই একজন আমেরিকাবাসী ভদ্রলোক শ্রীশ্রীমায়ের এই ভাববিহ্বল মূর্তি নয়নগোচর করে অভিভূত হয়ে মায়ের ভক্ত হয়ে পড়েন। সাধু দর্শনের জন্য তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন। অনেক সাধুসঙ্গও করেছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের সংস্পর্শে এসে তাঁর স্বভাবের হলো আমূল পরিবর্তন। চায়ের নেশাও ছেড়ে দিলেন। একবেলা আহার শুরু করলেন।

মা আনন্দময়ী যে তাঁর তপস্যালব্ধ শক্তি লোক-কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তা যে কোনও বিশেষ জাতি ও গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—এই অনাহূত বিদেশীটির উপর মায়ের অযাচিত কৃপা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সন্তানবৎসলা মা যে শুধু ঢাকার মা, শাহবাগের মা—বাঙালী মাতাজী আনন্দময়ী মা-ই নন। তিনি যে জগজ্জননী। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা। তাঁর কৃপা সর্বত্র। তিনি যে কৃপাময়ী মা। সর্ব-বর্ণময়ী পরব্রহ্মরূপিণী মাতৃমূর্তি।

দিল্লী আবার প্লাবিত হয়ে উঠলো। কোনও রাজা, বাদশাহ—

শাহেনশাহের আগমনে নয়। কোনও যুবরাজের রাজ্যাভিষেকেও নয়। দিল্লী! কত যুগের কত ঘটনার কথা দিল্লীর এই মাটি আর বাতাসের সঙ্গে নিঃশব্দে রয়েছে মিশে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অনেক রাজনীতির ঝঞ্ঝা এই দিল্লীর ভাগ্যাকাশ মথিত করে চলে গেছে। অনেক সিংহাসন অপসারিত হয়েছে। অনেক দুর্গের দ্বার হয়েছে চূর্ণ। আবার নূতন সিংহাসনে দেখা দিয়েছেন নূতন অধিপতি। আর দুর্গের নূতন দুয়ারে নূতন বাদশাহের রক্ষী-বাহিনীর ভিড়। পৃথ্বীরাজের দিল্লী। কবি চাঁদবরদাইয়ের দিল্লী। পাঠান, মোগল শাহেনশাহদের দিল্লী। সম্রাট শাহজাহানের দিল্লী। ঔরঙ্গজেবের দিল্লী। আর আপন ধর্মরক্ষার জন্য নিজ মস্তক বলি দিয়েছিলেন যে মহাপুরুষ—গুরু তেগ বাহাদুর সেই মহান তেগ বাহাদুরের দিল্লী। আজ আবার প্লাবিত হয়ে উঠেছে—ধর্মপ্রাণ তপস্বিনী এক মহিলার আগমনে। সরলা অবলা শাহবাগের সেই বউটি। ঢাকার মা। শাহ-বাগের মা। বাঙালী মাতাজী। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা'র আগমনে।

নামগানে। কৃষ্ণকীর্তনে। কৃষ্ণ গুণগানে মাতিয়ে তুলেছেন।—প্লাবিত করে দিয়েছেন সমস্ত দিল্লীকে।

দিল্লী প্লাবিত হয়ে উঠেছে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আগমনে। নাম-কীর্তনে। ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে নামগান। ওকলা। পুষা। নূতন দিল্লী। পুরাতন দিল্লী। কৃষ্ণকীর্তনে মেতে উঠেছে। কাশ্মীরী। পাঞ্জাবী। বাঙালী। ফরাসী। ইংরেজ। আমেরিকাবাসী। সকলেই আজ মায়ের ভক্ত। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রার্থী।

মা জীবের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম পৌঁছে দিচ্ছেন। মা গাইছেন,

ভজ গোবিন্দ, কহ গোবিন্দ, লহ গোবিন্দের
নাম রে—
যে জন গোবিন্দ ভজে সেই আমার
প্রাণ রে—
ওরে ওরে মূঢ় মন জান জান রে,—
জানিয়া হরিগুণ গাওরে—

প্রভাত সময় কালে পাখীরা সব ডালে ডালে
আনন্দে হরিগুণ গাওরে—

মা বলেন, 'নাম কর। নাম কর। নামের গুণ এই যে তা নামীকে এনে দেয়। দেখ না মাকে মা বলে ডাকলেই মা এসে কাছে দাঁড়ায়। যাকেই নাম ধরে ডাকবে, সেই কাছে এসে দাঁড়াবে। নামের এই গুণ। তাই নামীকে পাবার জন্য নামই আশ্রয় করতে হয়। আর দেখ আগুনের স্বভাব এই যে—সে সব জিনিসকেই নিজের স্বরূপ করে দেয়। ভিজা কাঠও যদি আগুনের কাছে থাকে তাও আগুনের গুণে শুকিয়ে শুষ্ক হয়ে ওঠে। শেষে আগুনের স্বরূপই হয়ে যায়। সেই জন্যই তাঁর সঙ্গ করলেই (অর্থাৎ তাঁর নাম করলেই তাঁর সঙ্গ করা হয়) তাঁকে পাওয়া যায়। আর সংসারে থেকে তাঁর সঙ্গ করার আরও একটা উপায়—এই যে পরমপিতা পরমপতিকেও কেহ দেখে নাই—তাই ঘরে ঘরে সেই পরমপতিই পতিরূপে আছেন এইভাবে চিন্তা করে, ছেলে মেয়েদেরও বালগোপাল ও কুমারীদের দেবীরূপে মনে করতে হয়। পতি, পুত্র, কন্যার সেবা করলেও সেই সেবা তাঁর নিকট পেঁ ছায়। এই ভাবেও তাঁর সঙ্গ করা হয়।'

* * *

যতক্ষণ নাম রূপ আছে, ততক্ষণ নামেই সব। দেখ না, একবার গিয়ে নদীতে পড়তে পারলে তারপর স্রোতেই সমুদ্রের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তখন আর কিছু করবার থাকে না। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত নাম করতে হয়।

সাঁইত্রিশ

পশুপাখী গাছপালা এদের মধ্যে যে চৈতন্য-সত্তা আছে এবং মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য-সত্তা আছে তা অভিন্ন। যেমন এক শূন্যের

মধ্যে আমরা আছি, শূন্যস্থানটা কেটে ভাগ করা যায় না ঠিক তেমনই।

মা বলছেন, একজন ইংরেজ মহিলাকে। নৈনিতালে। পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ এই মহিলাটিকে বলেন, 'মা আনন্দময়ী খুব উচ্চস্তরে অবস্থান করছেন, তাঁকে দর্শন কর।'

অবশেষে এই মহিলাটি নৈনিতালে এসে মায়ের দর্শন লাভ করেন এবং তৃপ্ত হন। মহিলাটি মনের সংশয় দূর করবার মানসে কয়েকটি প্রশ্ন শ্রীশ্রীমাকে করছেন। ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ইংরেজ মহিলাটিকে মায়ের বক্তব্য ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। দোভাষীর কাজ করছেন।

মহিলাটি জিজ্ঞেস করছেন,—আচ্ছা মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য-শক্তি আছে আর পশুপাখীতে যে চৈতন্যশক্তি আছে তাহা কি একই রকম? পশুপাখী গাছপালাও কি ভগবানের আরাধনা করতে পারে?

মা প্রত্যুত্তরে বলছেন, সবই ত তাঁর মধ্যে। তিনিই তাঁকে নিয়েই। মনুষ্যজন্ম যে শ্রেষ্ঠ। যেমন শিশুরূপী মূর্খ মানুষকেও শিক্ষার ফলে বিদ্বান করা যায়, কিন্তু গাছ বা পশুকে তদ্রূপ করা যায় না। মানুষের মধ্য দিয়াই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ হয়। আর ভগবানের আরাধনা গাছ বা পশু মানুষের মতন করিতে পারে না ইহা ঠিক, তবে তাহাদের শান্তি ও আনন্দের গতি আছে ইহাও সত্য। এর মধ্যে একটু বিশেষ কথা আছে, যেমন জড়ভরত হরিণ হইয়াছিল। যাহারা জাতিস্মর থাকে তাহাদের কথা ভিন্ন। এই রকম কখনও গাছপালা বা পশুপাখীও ভগবানের আরাধনা করে। ইহা বিশেষ যদি কোন কারণে কেহ সাময়িকের জন্য পশুপাখী গাছপালা হইয়া থাকে তবেই এই কথা।

—আচ্ছা এক ওঁ হইতেই জগৎ সৃষ্টি হইল আবার তাহাতেই লয় হইল কি প্রকারে? মাকে প্রশ্ন করছেন মহিলাটি।

মা মৃদু হেসে বললেন, যে ভাবে সৃষ্টি হইল সে ভাবেই লয়

হইল। যেমন যে রাস্তা দিয়ে নৈনিতাল থেকে এসেছিলাম, আবার সেই রাস্তা দিয়েই নৈনিতাল যাইতেছি।

মা মাঝে মাঝে দু' একটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করছেন এবং তা এতই শ্রুতিমধুর হয়ে উঠছে যে মহিলাটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছেন। এবং মায়ের মীমাংসা তাঁর কাছে এতই যুক্তিপূর্ণ-বলে মনে হলো যে তিনি ভাববিহ্বল হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলি গ্রহণ করলেন। সে এক অভাবনীয় অনির্বচনীয় দৃশ্য।

অবশেষে শ্রীশ্রীমা ইংরেজ মহিলাটিকে পরিয়ে দিলেন একখানি সিল্কের শাড়ি। মায়ের উপহার গ্রহণ করে মহিলাটি আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলেন,—আপনি আশীর্বাদ করুন, আজ আপনি এই যে পোশাক বাইরে পরিয়ে দিলেন ভিতরেও যেন আমি ইহার উপযুক্ত হইতে পারি। (তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ভারতবর্ষীয় এই পোশাক পরিধান করলে সাধু হতে হয়।)

ইংরেজ মহিলাটি মা আনন্দময়ী সম্বন্ধে বলছেন, 'আমি পণ্ডি-চেরীতে প্রথম অরবিন্দ ঘোষের নিকট মায়ের নাম শুনে তাঁকে দেখবার জন্য উৎসুক হই। কিন্তু কোনই খবর পেলাম না। কোথায় তাঁকে খোঁজ করব। ইতিমধ্যে আমি কলকাতা যাই। সেখানে মায়ের নাম শুনলাম। মায়ের ঠিকানাও পেলাম। তিনি নৈনিতালে আছেন। আমি নৈনিতাল এসে মাকে দর্শন করি। দর্শন করে মুগ্ধ হই। এমন সুন্দর মাতৃমূর্তি আর দেখি নাই। আমার মনে হয় তিনি কোন বিশেষ কাজের জন্য এসেছেন। কর্ম শেষ হলেই চলে যাবেন। আমি জানি ইনিই আমার একমাত্র মা। মা অন্তরের সব কথাই বোঝেন এবং তাঁর প্রতি একলক্ষ্য হয়ে থাকতে পারলে অন্তরেই তার উত্তর পাওয়া যায়। এর প্রমাণ আমি পেয়েছি। আর আমার মনে হয় কেহ যদি আমার মত মাকে স্থিরভাবে চিন্তা করতে পারেন, তবে সকলেই এর সত্যতা অনুভব করতে পারবেন। আমি ভারতেই থাকি বা ইংলণ্ডেই থাকি বা আমেরিকাতেই থাকি—

আমার বিশ্বাস মার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ কখনই হবে না। মা'র চিত্র সর্বদাই আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকবে।'

শ্রীশ্রীমা মহিলাটি সম্বন্ধে পরে বলেছিলেন, 'শান্ত মূর্তি—বেশ কাজ করে। একটু ফলও পাইতেছে।'

*   *   *

ভাবের নানা স্তরের অবস্থার বিবরণ সম্বন্ধে মা বলছেন ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রকে।

'এই যে কীর্তনাদিতে ভাব হয়, এও কত রকমের। কখনও হয়—নামের ধ্বনিতে শরীরে একটা তরঙ্গ ওঠে পড়ে, তাতে অবসাদ বা ক্লান্তি আসে। তাতে সাধক জড়বৎ খানিকক্ষণ পড়ে থাকে। প্রথম হয়—রূপের নেশায় ভরপূর—যেমন কৃষ্ণরূপে আত্মহারা। কৃষ্ণের পূজায়। কৃষ্ণের নামে ঢল ঢল অবস্থা।

আর একটু উপরের অবস্থা—যেমন কালো মেঘ দেখে কৃষ্ণের মূর্তি জেগে উঠলো অথবা যা দেখছো, মনে করছো—আমার কৃষ্ণেরই রূপ। তখন আমার কৃষ্ণ এই ভাবটি আছে।

চিত্তশুদ্ধি হলেই একলক্ষ্য হয়ে একের রূপে মজে যায়। একটা অবস্থা—রূপের নেশায় ঢল ঢল অবস্থা। সেই ভাবটা কমলেই কান্না আসে।

আর একটা অবস্থা—যা দেখে তাতেই প্রিয়তমের ছায়া দেখে আনন্দ পায়। তখনও মূর্তির উপর লক্ষ্য আছে।

আরও অবস্থা—জড়বৎ শরীর তখন পড়েই বেশী থাকে। একটু উঠলেই জড়বৎ হয়ে যায়। আবার এইও হয়—ব্রহ্মভাব। তখনই সাধক সাধ্য এক হয়ে যায়। তখন আর বিশেষ মূর্তির প্রতি লক্ষ্য নাই। এক ছাড়া কিছুই নাই—এই ভাব জেগে ওঠে। আরেকটা হলো এই সবিকল্প সমাধি, তখন এক সত্তা বোধ, আর কিছুই নাই। আরও অবস্থা—নির্বিকল্প সমাধি, তখন আর কিছুই নাই। অথবা কি আছে কি নাই। নাই বললেও বলা হয় না। আছে বললেও

বলা হয় না। কত রকম, বলা 'আর কতটুকু হয়— এক একটা দিকের কথা বলা হচ্ছে মাত্র।'

যদি কোন একটা অবস্থা ধরে বসে থাকা না যায় তবে একটার পর একটা আসবেই। কিন্তু যদি একটা অবস্থা ধরে থাকা হয় তবে ঐখানেই বদ্ধ হয়ে থাকতে হয়।

আবার একটা স্তরে দাঁড়ালেই যেটা ছেড়ে গেল, তারও ছায়া থাকবে। আবার যে স্তরটা পরে আসছে, তারও আভাস পূর্বস্তরে থাকতেই পাওয়া যায়। কাজেই একটা স্তরেই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনটে অবস্থাই খেলা করে। লক্ষণ দেখে বোঝা যায় কোন্ স্তরে আছে।

শ্রীশ্রীমা আবার বললেন, 'নির্বিকল্প সমাধির পর কাহারও শরীর ছেড়ে যেতে পারে।'

* * *

'ধন দৌলত কিসের জন্য ? নিজের জীবনধারণ ও পুত্র পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য। পুত্র পরিবার কার জন্য ? সরল ভাবে জবাব দিলে বলতে হবে, 'আমার জন্য'। তারপর যদি প্রশ্ন করা হয়—'এই আমি কে ?' তাহলে তার জবাব নেই। এই ত হলো তোদের বুদ্ধির দৌড়। 'আমি কে' একবার বেশ ভাল করে চিন্তা করে দেখ্ দেখি, তখন দেখবি, যে সব পুঁথিপত্র স্কুল কলেজে বসে এতদিন যা চর্বিত-চর্বণ করেছিস আর কর্মক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিস, তার ভিতর এই প্রশ্নের জবাব নেই। আমি ও আমার সন্ধান পেতে হলে পুরাতন চিন্তার ধারা বদলে সেই একতত্ত্বের সাধনায় মনোযোগ দিতে হবে। যখন চিত্ত চঞ্চল হলে, দৃঢ়তার সঙ্গে সরিয়ে এনে তাকে 'আমির' মূলে আকৃষ্ট রাখতে হবে। ইহাই আত্মদর্শনের উপায়।

তাই তো বলি, ভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে কর্ম করে যাবে। যেখানে যে ভাবেই থাকো সেই এক গান, একের চিন্তায় সময়টি একটু বেশী করে দিও।'

আটত্রিশ

—'মা, তোমাকে দেখে আমার বড়ই ভাল লাগছে। বাড়ি বাড়ি গান অনেক করেছি, এই সুন্দর স্থানে বসে গান কববার একান্ত ইচ্ছা।'

বলছেন দিলীপ রায় শ্রীশ্রীমাকে। কলকাতায়। বিড়লা পার্কের শিবমন্দিরে। মা উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে আবার ফিরে এসেছেন কলকাতাতে। ভক্তরা ঘিরে বসে আছেন। লোকে লোকারণ্য। দিলীপ রায়ও তাঁর আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসেছেন। আর এসেছেন শ্রীযুত মহেন্দ্র সরকার সস্ত্রীক। এসেছেন দীঘা-পাতিয়ার রাণী, সুগায়িকা রেণুকা সেন, ভক্ত দীনেশঠাকুর, নিবারণ সমাজপতি, ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, সংজ্ঞাদেবী, বাসন্তীদেবী ও কন্যা অপর্ণা-দেবী। আরও বালক, বৃদ্ধ, মেয়ে, পুরুষ অসংখ্য ভক্তের দল।

মা হাসি হাসি মুখে গান শুনবার ইচ্ছা জানালেন। দিলীপ রায় ভাবানন্দে বিভোর হয়ে ভজন গাইতে লাগলেন। সুমিষ্ট কণ্ঠ। অনির্বচনীয় ভাব।

—সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি,
আজিও পড়ে মনে মোর
পড়ে যে কেবলি ॥
ওরা জানে না তাই মানে না।
আমি জানি, তাই মানি
আমি অন্তরে তাঁর বাঁশরী শুনেছি।
তাই ওগো আমি মানি।—

সঙ্গীতের কলরোল শ্রোতৃবৃন্দের মনোভূমিতে সৃষ্টি করলো আলোড়নের। আর তাদের মেরুদণ্ড দিয়ে যেন প্রবাহিত হয়ে চললো আনন্দের শিহরণ। মন্দিরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চললো সেই সুমধুর সঙ্গীতের বন্যা। ঘরের প্রত্যেক

কোণ ভরাট হয়ে দেয়ালে দেয়ালে জেগে উঠতে লাগলো তার অনুরণন। সঙ্গীতের সেই শব্দতরঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দ যেন এদিক ওদিক চারিদিকে চলেছেন ভেসে। সেই তরঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া যেন তাঁদের আর কিছুই নেই করবার। এক অপরূপ সকরুণ মমতায় অন্তর তাঁদের উঠলো ভবে। এ সঙ্গীত নয়, ভজনও নয়। এ যেন কৃষ্ণের বাঁশীর সেই মর্মান্তিক সুরধ্বনি শুনছেন ভক্তবৃন্দ। কি মুক্তি! কি আনন্দ! অনির্বচনীয় এক আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন শ্রোতৃবৃন্দ। ভক্তবৃন্দ।

দিলীপ রায়ের সেই উন্মাদ দুরন্ত সঙ্গীত আর অনুরাগমত্ত অন্তরের আস্পন্দনে শ্রীশ্রীমাও হলেন ভাবাবিষ্ট। এবং অপরূপ জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ধারণ করলেন। সঙ্গীত শেষে আনন্দময়ী মা দিলীপ রায়ের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা।

ভক্ত দিলীপ রায় আনন্দিত চিত্তে বললেন,—মা, এখন তুমি কথা বলো। তোমার কথা শুনতেই এরা সকলে আমার সঙ্গে এসেছে। তোমার কথা শুনতে আমার বড়ই মিষ্টি লাগে, তাই আমি এদের এনেছি তোমার কথা শোনাতে।

মা মৃদু হেসে বললেন,—তোমাদের কান মিষ্টি তাই আমার কথা মিষ্টি শোন।

মায়ের মিষ্টি রসিকতায় সকলেই হেসে উঠলেন। মাও হাসলেন। আনন্দময় হয়ে উঠলো মন্দিরপ্রাঙ্গণ। তৃপ্ত হলেন দিলীপ রায় আর তাঁর সঙ্গীরা। আনন্দদায়িনী মা ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়েই ভক্তবৃন্দকে আনন্দ বিতরণ করেন। মা যে আনন্দময়ী।

অবশেষে বাসন্তীদেবী মাকে কোলে নিয়ে বসলেন আর অর্পণাদেবী শুরু করলেন কীর্তন। তারপর ভক্ত দীনেশঠাকুর, মন্মথনাথ, নিবারণ সমাজপতি, ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, রেণুকা সেন একে একে সকলেই মাকে গান শোনালেন। মাতৃমন্দির সঙ্গীত সাধনার মন্দিরে হলো রূপান্তরিত। এ যেন সঙ্গীতের দেবীর সম্মুখে অবিরাম চলেছে

সঙ্গীত সাধনা। গীতাঞ্জলি অর্পণ করছেন ভক্তরা সঙ্গীতের বরদাত্রী দেবীর শ্রীচরণকমলে। আর সেই ভক্তির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো বিড়লা-মন্দির। মাতৃমন্দির।

মা বেশী কথা বলেন না, উপদেশও দেন না। দেন চৈতন্য। দুর্ভেদ্য অন্ধকার সরিয়ে পথ দেখান আলোকের। সে আলোর স্পর্শে হাজার বছরের বন্ধ ঘরের অন্ধকার এক পলকে যায় পালিয়ে। আলো জ্বললে সঞ্চিত পুঞ্জিত অন্ধকার একটু একটু করে যায় না। সম্পূর্ণ টাই অদৃশ্য হয়ে যায় এক মুহূর্তে। গ্রন্থিমোচন। দৃষ্টির গ্রন্থি। স্পর্শের গ্রন্থি। আকাঙ্ক্ষার গ্রন্থি।

মা বলছেন, বাহিরের কর্মে অভাবের নিবৃত্তি হয় না। এসব যে অভাবের কর্ম। অভাবের কর্মের স্বভাবই এই যে সে সদা-সর্বদা অভাব জাগ্রত করে রাখে। তাই স্বভাবের কর্ম করতে হয়। এমন বন্ধন নিতে হয় যাতে সর্ব-বন্ধন নষ্ট হয়। গ্রন্থিমোচন আর কি। বাহিরের দৃষ্টি, বাহিরের ভাব কমিয়ে দিয়ে অন্তর্মুখী হয়ে যেতে হয়।

তারপর সুর করে বলছেন,

তাঁহারি গান গেয়ে,
চল তাঁহার দিকে ধেয়ে,
যায় দিন বয়ে।

*　　　*　　　*

শ্রীশ্রীমা এখন অধিকাংশ সময়ই ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন। ভাব-সমাধি। এক এক সময় এক এক ভাব। মায়ের ভাবেরও নেই বিরাম। এখন আবার তপস্বিনী পার্বতীর ভাব। শিবের তপস্যায় মগ্ন।

'যোগাসনে মহাধ্যানে মগন যোগিবর,
অনন্ত তুষারে যেন অনন্ত শেখর।'

সেই শশাঙ্কশেখর শম্ভু শঙ্কর পিনাকধারী ত্রিলোকপালক সাধক-জন-গণ-মানস-বিহারী দেবাদিদেব মহাদেবের চিন্তায় মন তাঁর